জননেতা কমরেড মণি সিংহ

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের কিংবদন্তির নায়ক

সংক্ষিপ্ত জীবনী

১৯০১-১৯৯০

কমরেড মণি সিংহ মেলা উদযাপন কমিটি

সুসং-দূর্গাপুর, নেত্রকোনা

জননেতা কমরেড মণি সিংহ

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের কিংবদন্তির নায়ক

সম্পাদনা:
অধ্যাপক এম এম আকাশ
অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধানে:
মণি সিংহ উদযাপন কমিটি

প্রকাশকাল:
ডিসেম্বর, ২০১৫

শৈলী সম্পাদনা ও অঙ্গসজ্জা:
মাহমুদুর রহমান

মুদ্রণে:
মাটি আর মানুষ প্রিন্টিং-প্যাকেজার

মণি সিংহ'র জীবনী লেখা এত ছোট পরিসরে দুঃসাধ্য কাজ, তারপরও নতুন প্রজন্ম'কে জানাবার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এ সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করা হল। এ সংক্ষিপ্ত জীবনীর তথ্যসমূহ সাপ্তাহিক একতা, বজলুর রহমান লিখিত শেখ মুজিব ও মণি সিংহের ঐতিহাসিক বৈঠক (সংবাদ ২৮শে জুলাই, ২০০১), সত্যেন সেন রচিত জননেতা মণি সিংহ (জানুয়ারি ১৯৬৯) ও কমরেড মণি সিংহ লিখিত জীবন-সংগ্রাম বই থেকে সংকলিত।

ঢাকা ২৬শে ডিসেম্বর, ২০০২

সূচীপত্র

১. কমরেড মনি সিংহর সংক্ষিপ্ত জীবনী........................

২. বর্নাঢ্য রাজনৈতিক জীবনের ছবি........................

৩. টংক শহীদ স্মৃতি স্তম্ভ..................................

৪. কমরেড মনিসিংহর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী...

৫. কমরেড মনিসিংহ মেলার অনুষ্ঠানের ছবি..................

৬. প্রকাশিত পোষ্টার ও আমন্ত্রনপত্র ....

কমরেড মনি সিংহের সংক্ষিপ্ত জীবনী

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের কিংবদন্তি পুরুষ মণি সিংহ ১৯০১ সালের ২৮শে জুলাই কলকাতার এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র আড়াই বছর বয়সে তাঁর পিতা কালি কুমার সিংহ'র মৃত্যু হলে পরিবার সহায়-সম্বলহীন হয়ে পড়ে। তাঁরা কিছুদিন ঢাকায় তাঁর মামা ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সুরেন সিংহের বাড়িতে থাকেন।

মণি সিংহ'র জননী সরলা দেবী ছিলেন ময়মনসিংহ জেলার সুসং-দুর্গাপুরের জমিদারদের বড় তরফের বোন। মণি সিংহের সাত বছর বয়সের সময় তাঁর বিধবা মাতা সে-সুত্রে জমিদারদের কাছ থেকে বসতবাটিসহ কিছু ভূসম্পত্তি, সাংবাৎসরিক খোরাকী ও শরিক হিসাবে মাসোহারা পেয়ে সুসং-দূর্গাপুরে বাস করতে থাকেন। এখানে স্কুল শিক্ষা লাভের সময় তিনি "অনুশীলন" দলের সাথে পরিচিত হন। "অনুশীলন" দল সন্ত্রাসবাদী পদ্ধতিতে বৃটিশ রাজ উচ্ছেদ সম্ভব বলে মনে করতো। মণি সিংহ ১৯১৪ সালে "অনুশীলন" দলে যোগ দিয়ে ক্রমশঃ তৎকালীন বাংলার বিপ্লবী কর্মকান্ডে নিজের স্থান করে নেন।

"দুই শত বছরের বৈদেশিক শাসনের জিঞ্জির থেকে উপমহাদেশকে মুক্ত করার সংগ্রামে অসহযোগ খেলাফত আন্দোলনের আমলে যে বিপ্লবী যুবকেরা সর্বস্ব ত্যাগ করে সামনের সারিতে এসে যোগ দিয়েছিলেন কমরেড মণি সিংহ তাঁদের অন্যতম।"

১৯২১ সালে অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনের বিপুল গণজাগরণ তরুন মণি সিংহের মনে গভীর রেখাপাত করে এবং সন্ত্রাসবাদী পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর মনে সংশয় দেখা দেয়। ব্রিটিশবিরোধী সশস্ত্র জাতীয় সংগ্রামে কৃষকদের টেনে আনার উদ্দেশ্যে তিনি নিজ জেলার কৃষকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন।

১৯২৫ সালে রুশ বিপ্লবের আদর্শে উদ্বুদ্ধ প্রখ্যাত বিপ্লবী গোপেন চক্রবর্তীর সঙ্গে সুসং-এ আলোচনার পর মণি সিংহ মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে আদর্শরূপে গ্রহণ করেন এবং কলকাতার গিয়ে অনুশীলন দলের সঙ্গে চূড়ান্তভাবে সম্পর্ক ছেদ করেন।

এ প্রসঙ্গে কমরেড মণি সিংহ তাঁর জীবন সংগ্রাম বই'এ লিখেছেন ঃ

"সুসং-দুর্গাপুরে সুরেশ চন্দ্র দে নামে এক পোষ্টমাস্টার ছিলেন। তিনি ছিলেন অনুশীলন পার্টির উচ্চ কমিটির সদস্য। তাঁর সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা যায়, তিনি ছিলেন যুবক, স্বাস্থ্য খুব ভাল, গ্রাজুয়েট, কট্টর এবং শৃঙ্খলাপূর্ণ। তাঁর বাড়ি ছিল ময়মনসিংহ জেলার রাম গোপালপুরে। তাঁর সাথে পার্টিগত ভাবেই আমাদেরও পরিচয় হয়ে যায়। তিনি

সুসং পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস থেকে বদলি হয়ে ময়মনসিংহ শহরে চলে যান। পরে ময়মনসিংহ হতে লোক মারফত একটি চিঠি পাঠান এই মর্মে যে, একজন বিশিষ্ট বন্ধুকে পাঠাচ্ছি তাকে গোপনে রাখবেন এবং তাঁর সাথে বিস্তারিত আলাপ আলোচনা করবেন। আমরা ঠিক করলাম সুসং-দুর্গাপুর থেকে ছয় মাইল দুরে নাগেরগাতি গ্রামে তাকে রাখতে হবে। সেটা আমার কাকীমার বাপের বাড়ি। সেখানে থাকলে জানাজানি হবে না। সে বাড়িতে আমার চাচাত ভাই শচী সিংহও থাকতেন। কথিত ভদ্রলোক এসে উপস্থিত হ'লেন। বেশ নাদুস-নুদুস চেহারা, গায়ের রং ফরসা, বয়স আমাদের চাইতে কিছু বেশী। নাগেরগাতিতে সকলের সঙ্গে আলোচনা করার সুবিধা হবে না বিবেচনা করে আমরা তাঁকে পাহাড় অঞ্চলে জগৎকুড়া গ্রামে নিয়ে গেলাম। এক পাহাড়ে টিলার উপর আমাদের একটি ঘর ছেড়ে দেয়া হল। টিলাটি বেশ উচু। পানি আনতে হতো টিলার নিচ হতে।

এখানে আলোচনার জন্য আমারা উপস্থিত ছিলাম চারজন-প্রভাত চক্রবর্তী, উপেন সান্যাল, মণি সিংহ ও শচী সিংহ। যে ভদ্রলোকটি এসেছিলেন তাঁর নাম গোপেন চক্রবর্তী। তিনি এখানে আসার কয়েক মাস আগে মস্কো থেকে ফিরে এসেছিলেন। আমাদের সাক্ষাতের সময়টা ছিল ১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাস। গোপেন চক্রবর্তী জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা এখানে কি করছো?" আমরা বললাম,"আমরা স্কুল করেছি, হাজংদের জন্য পুরোহিতের ব্যবস্থা করেছি এবং এদের ইচ্ছানুযায়ী এদের হাতে আমরা পানি খাচ্ছি। এদের পক্ষে আনার চেষ্টা করছি। কারণ বৃটিশদের তাড়াতে হলে বহু লোক দরকার। এরা সাহসী, সৎ এবং দুর্ধর্ষও বটে। তাছাড়া এদের মধ্যে আমাদের জনপ্রিয়তা বেড়েছে। এদের আমরা সঙ্গে পাব।" এই কথা শুনে গোপেন চক্রবর্তী বললেন, "তোমরা ভস্মে ঘি ঢালছ।" আমরা এতে খুব ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলাম। আমাদের এসব কাজের স্বীকৃতি নাই-ই, একেবারে তুচ্ছ করে দিচ্ছে। তিনি বললেন, "এরূপ আন্দোলন করে বৃটিশকে উচ্ছেদ করা যাবে না। দেশে হিন্দু আছে, মুসলমান আছে, হিন্দুদের মধ্যে উচ্চ ও নিম্নবর্ণ আছে। তোমরা হাজংদের হাতে পানি খাচ্ছ, কিন্তু মেথরদের হাতে পানি খেলে সব হাজং তোমাদের ছেড়ে চলে যাবে। এই সংস্কারমূলক আন্দোলন দিয়ে সব মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা যাবে না। মুসলমানদের তোমরা কিভাবে সংগঠিত করবে? বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদ করতে হলে ভারতের সমগ্র জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। দেশের স্বাধীনতা কায়েম করে শোষণমুক্ত সমাজ অর্থাৎ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। নচেৎ শোষক ও শোষিতের সমস্যার সমাধান হবে না। সর্বহারা শ্রমিকরাই হল সবচেয়ে বিপ্লবী। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের হারাবার কিছু নেই। এদেশে প্রথমে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে উচেছদ করতে হবে সত্য, কিন্তু সাথে সাথে সামন্ততান্ত্রিক প্রথারও উচ্ছেদ প্রয়োজন। দেশের গরীব জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করতে হলে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে আন্দোলন করে তাদের রাজনৈতিকভাবে সচেতন করতে হবে। কেন আমাদের দুর্দশা; কেন আমরা বঞ্চিত শোষিত তা জনগণকে বোঝাতে হবে। সামাজিক সংস্কার

দিয়ে রাজনৈতিক সাফল্য আনা যায় না।"

তিনি শ্রেণী সংগ্রামের ওপর বিশেষ জোর দিলেন। গলা ফাটিয়ে তর্কবিতর্ক হল। এমন আওয়াজ হল যে বাড়ির বয়স্করা ঘরের সামনে দিয়ে যাতায়াত করতে লাগলেন। তাঁরা ভাবছিলেন ঝগড়া বাধল নাকি ! আমি যুবক, আমার গলা ছিল সবচেয়ে চড়া। আমাদের রাজনৈতিক জ্ঞান ছিল স্বল্প। আমরা অবশ্য তখন রাশিয়ার বিপ্লবের কথা শুনেছি এবং এটাও শুনেছি যে সেখানে কুলিমজুররা ক্ষমতা দখল করেছে, বড়লোক সব খতম। জার বা সম্রাট খতম। কিন্তু সে বিপ্লব সম্পর্কে তেমন কিছু জানতাম না। সে সময় দেশে রাশিয়ার বিপক্ষে, লেনিনের বিরুদ্ধে অপপ্রচারই হত বেশি। বলা হত কুলিমজুরের রাজত্ব আর ক'দিন থাকবে। কিছু দিনের মধ্যে সব শেষ হয়ে যাবে। আমরা অবশ্য ভ্যানগার্ড প্রভৃতি পত্রিকা কখনও কখনও পেয়েছি। তবে সেগুলো থেকে মূল মর্ম ও পথ উদ্ধার করতে পারিনি। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনাই ছিল আমাদের সম্বল। কিভাবে সাম্রাজ্যবাদকে খতম করতে হবে সে ধারণা ছিল সম্পূর্ণ অস্পষ্ট।

এই অবস্থায় তর্কবিতর্ক কয়েকদিন হল বটে, কিন্তু গোপেনদা সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে যতটুকু জ্ঞান সঞ্চয় করে এনেছিলেন তা-ই ছিল আমাদের জন্য যথেষ্ট। কারণ শ্রেনী সংগ্রামের রাজনীতির কথা ইতিপূর্বে আমরা কখনও শুনিনি। আমরা গোপেনদা'র যুক্তি মেনে নিলাম। প্রভাত চক্রবর্তী তখন কিছু বলেননি। আমাদের মনে হল তিনিও ওটা মেনে নিয়েছেন। অবশ্য পরে আন্দামান বন্দীশালায় তিনি কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণ করেন। এই সময়ে কথা হয় শ্রমিকরাই সবচেয়ে বিপ্লবী; কাজেই তাদের মধ্যে প্রথমে কাজ আরম্ভ করতে হবে, পরে কৃষকদের মধ্যে। আমি বললাম,"আমি কলকাতায় গিয়ে কাজের একটা ব্যবস্থা করে অন্যদের সেখানে নিয়ে যাব। কারণ, কলকাতায় আমি দীর্ঘ দশ বছর ছিলাম। কলকাতা আমার জানা জায়গা। আমার আত্মীয় স্বজন আছেন, কাজেই কলকাতায় আমার থাকার কোন অসুবিধা নেই। এই সব কথার পর ঐ জায়গার কাজ প্রায় গুটিয়ে আমি কলকাতায় চলে এলাম।" এভাবে মণি সিংহ কলকাতার মেটিয়াবুরুজে শ্রমিক রাজনীতি শুরু করেন। ১৯২৮ সালের মেটিয়াবুরুজে কেশোরাম কটন মিলে শ্রমিকদের ১৩ দিনব্যাপী ধর্মঘটে নেতৃত্ব দিয়ে তিনি দাবি আদায় করতে সক্ষম হন।

১৯৩০ সালের ৯ মে মণি সিংহ কলকাতায় গ্রেপ্তার হন। ১৯৩৫ সালে জেল থেকে মুক্তি পেলেও নিজ গ্রাম সুসং-এ তাঁকে অন্তরীণ রাখা হয়। এ সময়ে ঐ এলাকায় টংক প্রথার অত্যাচারে নিপীড়িত কয়েকজন কৃষক তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সে সময় জমিদারের অধীনস্থ এক মজুরের পক্ষাবলম্বন করায় আপন মাতুল বংশের জমিদারের সঙ্গে তাঁর বিরোধ সৃষ্টি হয়। একই সময় পাট চাষীদের এক সভায় মণি সিংহ কৃষকদের পক্ষ নিয়ে পাটের ন্যায্য মূল্য দাবি করে ভাষণ দিলে তাঁর দেড় বছর কারাদন্ড হয়। দেড় বছর পর জেল থেকে মুক্ত হয়ে তিনি পুনরায় নদীয়া জেলার এক গ্রামে অন্তরীণাবদ্ধ হন।

অন্তরীণাবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে ১৯৩৭ সালে তিনি মাকে দেখার জন্য সুসং-এ আসেন। মণি সিংহ জীবন-সংগ্রাম বইটিতে পার্টির সদস্যপদ প্রাপ্তি বিষয়ে লিখেছেন,“১৯২৫ সালে কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শে অর্থাৎ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ দীক্ষা নিয়ে ১৯২৮ সাল থেকে সর্বক্ষণের কর্মী হয়ে যাই। তখন পার্টিতে সভ্যপদ খুবই সংকীর্ণ ভিত্তিতে দেয়া হত। কাজেই আমি শ্রমিক আন্দোলনে একনিষ্ঠভাবে কাজ করলেও পার্টির সভ্যপদ তখনও পাইনি। তবে কমরেড মুজফ্ফর আহমদ আমাকে ওয়ার্কার্স এন্ড পিজেন্টস পার্টিতে নিয়ে নেন ১৯২৮ সালে। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির কথা তিনি ঘূনাক্ষরেও বলেননি। জেল থেকে বের হয়ে এলে আমি পার্টির সভ্য বলে আমাকে জানানো হয়। তখন ১৯৩৭ সাল।” মণি সিংহের নিজ এলাকার দশাল গ্রামের মুসলমান কৃষকরা টংক প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামে মণি সিংহের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কৃষকদের আন্দোলনের নেতৃত্ব দিলে মণি সিংহের আপন মাতুলদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংঘাতে লিপ্ত হতে হয়। ফলে এখানে তিনি জীবনের একটি জটিল সিদ্ধান্ত গ্রহণের মুখোমুখী হন। কিন্তু রক্ত ও সম্পত্তির সম্পর্ক অপেক্ষা মণি সিংহের কাছে জীবনাদর্শ ও কর্তব্যবোধই বড়ো হলো। তিনি টংক প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠনে এগিয়ে যান।

কমরেড মণি সিংহ এ প্রসঙ্গে জীবন-সংগ্রাম বই’এ লিখেছেন ঃ

“আমি ১৯৩৭ সালের মাঝামাঝি করিমপুর থানা, নদীয়ার জেল থেকে মুক্তি পাই। আমি মুক্তি পেয়ে কলকাতায় গেলাম, কিন্তু বন্ধু কমিউনিস্টদের কারও দেখা পেলাম না। ঐ সময়ে কলকাতা ছাড়া আর কোথাও কমিউনিস্ট পার্টি ছিল না। সেই কমিউনিস্ট পার্টিও ছিল আত্মগোপনে। আমার কাছে যে রেলওয়ে পাস ছিল-ঐ পাস নিয়ে ঐ দিনই-আমার গ্রামের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলাম- মায়ের সাথে দেখা করার জন্য। গ্রামে আসার ২/৩ দিনের মধ্যেই মুসলিম কৃষকরা আমার সাথে দেখা করতে এলেন। ৮/১০ জন বয়স্ক মুসলিম কৃষক আমার বাড়িতে এসে বললেন, “খোদার রহমতে আপনে খালাস পাইছেন-আমরা খুব খুশি হইছি। এহন আপনে টংকটা লইয়া লাগুইন। আমরা আর টংকের জ্বালায় বাঁচতাছি না।” আমি তাঁদের বললাম, “আমি কলকাতায় শ্রমিক আন্দোলন করি, মাকে দেখার উদ্দেশ্যে সাতদিনের জন্য বাড়ি এসেছি, কাজেই আমি ফিরে যাবো।” তাঁরা বললেন, “এডা হয় না। দেশের ছাওয়াল দেশে থাকিয়া টংক লইয়া লাগুইন। আমরা যাতে বাঁচি তার চেষ্টা করুইন। খোদা আপনার ভালা করব।” আমি তাঁদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দিলাম। কিন্তু প্রতিদিন তারা এসে আমাকে টংক আন্দোলন করার জন্য অনুরোধ করতে থাকলেন।

চার পাঁচদিন পর- একদিন রাত্রিবেলায় শুয়ে শুয়ে চিন্তা করলাম যে, আমি কি ট্রেড ইউনিয়ন কাজের জন্য কলকাতা যেতে উদগ্রীব? ঐ সময়ে মেটিয়াবুরুজে একটি ট্রেড ইউনিয়নের বেস (Base) সৃষ্টি হয়েছিল, কারণ আমরা প্রতিটি শ্রমিক সংগ্রামে জয়লাভ করেছিলাম। এখানে টংক আন্দোলন করা জটিল ও কঠিন ব্যাপার। কারণ যাদের

বিরুদ্ধে টংক আন্দোলন করতে হবে, তারা সবাই আমার আত্মীয়। কেবল তাই নয়, আমার নিজ পরিবারেরও টংক জমি আছে। কাজেই সকলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। হয়ত এই সব কারণে আমি পিছিয়ে যাচ্ছি। এই কথা যখন আমার মনে উদয় হল, তখন আমার মধ্যে এক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হল। ট্রেড ইউনিয়ন না টংক আন্দোলন?

টংক প্রথা

টংক মানে ধান কড়ারী খাজনা। হোক বা না হোক কড়ার মত ধান দিতে হবে। টংক জমির ওপর কৃষকদের কোন স্বত্ব ছিল না। ময়মনসিংহ জেলার উত্তরে কলমাকান্দা, সুসং-দূর্গাপুর, হালুয়াঘাট, নালিতাবাড়ি, শ্রীবর্দি থানায় এই প্রথা প্রচলিত ছিল। বিশেষ করে সুসং-জমিদারি এলাকায় এর প্রচলন ছিল ব্যাপক। কেন টংক নাম হল সেটা জানা যায় না, এটা স্থানীয় নাম। এই প্রথা বিভিন্ন নামে ঐ সময়ের পূর্ববঙ্গে প্রচলিত ছিল, যেমন চুক্তিবর্গা, ফুরন প্রভৃতি। ঐ সময়ে পশ্চিমবঙ্গেও ঐ প্রথা প্রচলিত ছিল। সুসং-জমিদারি এলাকায় যে টংক ব্যবস্থা ছিল তা ছিল খুবই কঠোর। সোয়া একর জমির জন্য বছরে ধান দিতে হ'ত সাত থেকে পনের মন। অথচ ঐ সময়ে জোত জমির খাজনা ছিল সোয়া একরে পাঁচ থেকে সাত টাকা মাত্র। ঐ সময়ে ধানের দর ছিল প্রতিমন সোয়া দুই টাকা। ফলে প্রতি সোয়া একরে বাড়তি খাজনা দিতে হ'ত এগার টাকা থেকে প্রায় সতের টাকা। এই প্রথা শুধু জমিদারদের ছিল তা নয়; মধ্যবিত্ত ও মহাজনরাও টংক প্রথায় লাভবান হতেন। **একমাত্র সুসং-জমিদাররাই টংক প্রথার দুই লক্ষ মন ধান আদায় করতেন। এটা ছিল এক জঘন্যতম সামন্ততান্ত্রিক শোষণ।**

সুসং-জমিদাররা গারো পাহাড়ের অধিকার হতে বঞ্চিত হয়ে মনে হয় এই প্রথা প্রবর্তন করেন। জোত স্বত্বের জমির বন্দোবস্ত নিতে হলে প্রতি সোয়া একরে একশত টাকা থেকে দুইশত টাকা নজরানা দিতে হত। গরীব কৃষক ঐ নজরানার টাকা সংগ্রহ করতে সমর্থ ছিলেন না। টংক প্রথায় কোন নজরানা লাগত না। কাজেই গরীব কৃষকের পক্ষে টংক নেওয়াই ছিল সুবিধাজনক। টংকের হার প্রথমে এত বেশি ছিল না। কৃষকরা যখন টংক জমি নেওয়ার জন্য এগিয়ে আসলেন, তখন প্রতি বছর ঐ সব জমির হার নিলামে ডাক হত। ফলে হার ক্রমে বেড়ে যায়। যে কৃষক বেশী ধান দিতে কবুল করত তাকেই অর্থাৎ পূর্বত বেশি ডাককারী কৃষকের নিকট থেকে জমি ছাড়িয়ে হস্তান্তর করা হত। এই ভাবে নিলাম ডাক বেড়ে গিয়ে ১৯৩৭ সাল থেকে হার সোয়া একরে পনের মন পর্যন্ত উঠে যায়।

আমি ভাবতে লাগলাম আমি যদি মার্কসবাদ-লেনিনবাদে বিশ্বাসী হই, যদি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ গ্রহণ করে থাকি, তবে সেখানে আমার এবং আমার পরিবারের স্বার্থ নিহিত রয়েছে-প্রয়োজনে ও আদর্শের জন্য তার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা আমার

কর্তব্য। যা অন্যায়, যা সামন্ততান্ত্রিক অবশেষে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাও উচিত। সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে চেতনা উদ্দীপিত করা ও তাদের সংগঠিত করা একান্ত প্রয়োজন। এবং এইভাবেই দেশকে স্বাধীনতা সংগ্রামে অগ্রসর করে নেয়া সম্ভব। এটা আমার আদর্শের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এখানে আমার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্বার্থ নিহিত আছে বলে আমি ঐ আন্দোলন হতে কখনোই নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারি না। আমার স্বার্থ আছে বলেই আমাকে কৃষকদের নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। কৃষকদের এই সংগ্রামে সাথী হয়ে যদি এই সংগ্রাম গড়ে তুলতে পারি, তবেই আমার সঠিক পথে যাত্রা শুরু হবে। এটা আমার জীবনের মূল পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় আমাকে উত্তীর্ণ হতেই হবে। এই দ্বন্দ্ব আমার মধ্যে চলতে লাগল; যার সাথে পরামর্শ করতে পারি এমন কোন বন্ধুও তখন ছিল না। আমার মন ও মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আদর্শই ছিল আমার বড় বন্ধু। আমার দুই দাদা ছিলেন ভিন্ন চেতনা ও চিন্তার মানুষ। তাদের সাথে পরামর্শ করার প্রশ্নই ছিল না। সমগ্র ময়মনসিংহ জেলায় এমন একজন কেউ ছিল না যার সাথে পরামর্শ করা যেতে পারত।

"আমার যতটুকু মার্কসবাদ-লেনিনবাদের জ্ঞান ছিল, আর যেটুকু শ্রমিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা হয়েছিল তাকেই ভিত্তি করে সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, টংক আন্দোলনে আমি সর্বতোভাবে শরিক হবো।" এভাবে মণি সিংহ টংক আন্দোলনের সাথে জড়িত হলেন এবং কাল-ক্রমে এ আন্দোলনের অবিসম্বাদিত নেতায় পরিণত হলেন।

আন্দোলনের তীব্রতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেলে ১৯৪০ সালে সরকার সার্ভে করে টংকের পরিমান কমিয়ে দেয়। ১৯৪১ সালের জানুয়ারী মাসে গভর্নর টংক এলাকার অবস্থা সচক্ষে দেখতে এলে পূর্বাহ্নে কয়েকজন সহকর্মীসহ মণি সিংহকে গ্রেপ্তার করে ১৫দিন আটক রাখা হয়। ছাড়া পেয়ে পরিস্থিতি বুঝে তিনি আত্মগোপন করেন। ব্রিটিশ সরকার টংক প্রথার সংস্কার করলেও প্রথাটি উচ্ছেদ হলো না। আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী সংগঠন কৃষক সভা "টংক" প্রথার পুরোপুরি উচ্ছেদ চাইলো।

১৯৪৪ সালে মণি সিংহ সারা বাংলার কৃষাণ সভার প্রেসিডিয়ামের সভ্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৫ সালে নেত্রকোনায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কৃষাণ সভার ঐতিহাসিক সম্মেলনে অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে মণি সিংহ ছিলেন সম্মেলনের অন্যতম প্রধান সংগঠক। এ সম্মেলনে নেত্রকোণা শহরের নাগড়ার মাঠে একলক্ষ লোকের সমাবেশ ঘটে। এ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কমরেড মোজাফ্ফর আহমদ, পিসি যোসি সহ ভারত বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ। ১৯৪৬ সালে অনুষ্ঠিত ভারতের সাধারণ নির্বাচনে তিনি নেত্রকোনা জেলার নিজ এলাকা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরও টংক আন্দোলন চলতে থাকে এবং সশস্ত্র আন্দোলনের রূপ নেয়। সে সময়ে প্রচলিত গল্প ছিল যে, কমরেড মণি সিংহ একটি সাদা ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ১৯৫০ সালে টংকের পরিবর্তে টাকায় খাজনা প্রবর্তিত হয় এবং জমিতে কৃষকের স্বত্ব স্বীকৃত হয়। মণি সিংহের নেতৃত্বে এই সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থা উচেছদের এই আন্দোলনকে মেয়ে-পুরুষ-শিশুসহ ৬০জন সংগ্রামীকে পুলিসের গুলিতে প্রাণ দিতে হয়েছে। কৃষকদের শতশত বাড়ি ধুলিসাৎ ও গ্রাম পুড়িয়ে ছারখার করা হয়েছে। এই আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে এলাকায় কৃষক সভা ও কমিউনিস্ট পার্টির শক্তিশালী তৃণমূল সংগঠনও গড়ে উঠেছিল। পাকিস্তানে প্রথম মুসলিম লীগ সরকার মণি সিংহের বাড়ি ভেঙ্গে ভিটায় হালচাষ করায় এবং তাঁর স্থাবর সম্পত্তি নিলাম করে দেয়।

এ প্রসঙ্গে উলেখ্য যে, স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান কমরেড মণি সিংহ 'কে তার বাড়ি-ভিটা ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। এর উত্তরে কমরেড মণি সিংহ বলেছিলেন, "টংক আন্দোলন ও বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনে লক্ষ লক্ষ মানুষ তার প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে এবং তাদের বাড়ি ঘর উচ্ছেদ হয়েছে। যতদিন পর্যন্ত এই দেশের প্রতিটি মানুষের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-চিকিৎসা ও কর্মসংস্থান না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত আমার বাড়ি-ভিটা ফিরিয়ে নেয়ার প্রশ্ন উঠতে পারে না। যে দিন সবার ব্যবস্থা হবে সেদিন আমারও ব্যবস্থা হবে। "

এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সাহিত্যিক সত্যেন সেন লেখেছেন ঃ

"১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পরে পূর্ণ গণতন্ত্র ও শোষণমুক্ত সমাজের আদর্শকে যাঁরা সামনে এনেছেন মণি সিংহ তাঁদের একজন। বাংলার মেহনতী মানুষের সর্বাঙ্গীন মুক্তি সংগ্রামে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগঠক এই প্রিয় নেতাকে কায়েমী স্বার্থের রক্ষকেরা দমন করার সব রকম চেষ্টাই করেছেন।"

পাকিস্তান হওয়ার পর থেকে ১৯৬৭ সালের নভেম্বর মাসে গ্রেপ্তার হওয়া পর্যন্ত মণি সিংহ বস্তুতঃ একটানা ২০ বছর আত্মগোপনে থাকতে বাধ্য হন। ১৯৪৮ সালে অল্প কয়েকদিন এবং ১৯৫৫ সালে আবু হোসেন সরকারের মুখ্য মন্ত্রিত্বের সময় এক মাস তিনি প্রকাশ্যে থাকতে পেরেছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে হুলিয়া জারী ছিল এবং আইয়ূব সরকার তাকে ধরিয়ে দেয়ার জন্য দশ(১০) হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। ১৯৪৮ সালের ৬ মার্চ এক সম্মেলনের মাধ্যমে তদানীন্তন পাকিস্তান এবং পূর্ববঙ্গের কমিউনিস্ট পার্টি সশস্ত্র বিপ্লবের এক 'বাম হটকারী' নীতি গ্রহণ করেছিল। পরে ঐ ভুল লাইন ত্যাগ করে ১৯৫১ সালে পার্টির দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে মণি সিংহকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক (সাধারণ সম্পাদক) নির্বাচিত করা হয়। পার্টির আত্মগোপন অবস্থায় ১৯৫৬ সালে অনুষ্ঠিত তৃতীয় সম্মেলনে

মণি সিংহ পুনরায় পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। তৃতীয় সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়। পাকিস্তান আমলে বেআইনী অবস্থায় থেকে কমিউনিস্ট পার্টি কমরেড মণি সিংহের নেতৃত্বে বাঙ্গালীর স্বাধিকার আন্দোলন ও পাকিস্তানী স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলনে ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর প্রমাণ পাওয়া যায় সংবাদ সম্পাদক বজলুর রহমানের লেখায়ঃ

"১৯৬১ সালে নভেম্বর মাসের শেষে পাকিস্তানের মার্শল'র বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তোলার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আওয়ামী লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির ভেতর এক ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠক সংগঠিত করেছিলেন বিখ্যাত সাংবাদিক জহুর হোসেন চৌধুরী এবং এ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে শেখ মুজিবুর রহমান (তখনও তিনি বঙ্গবন্ধু হননি) এবং ইত্তেফাক সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) এবং কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন কমরেড মণি সিংহ ও খোকা রায়। ঐক্য ও সহযোগিতার প্রশ্নে মোটামুটি মনস্থির করেই উভয়পক্ষের নের্তবৃন্দ বৈঠকে এসেছিলেন। তাসত্ত্বেও চার চারটি দীর্ঘ বৈঠকের প্রয়োজন হয় কর্মসূচী চূড়ান্ত করতে। যে দাবিটির অন্তর্ভূক্তি নিয়ে বিতর্ক দেখা দেয় তা হলো পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার প্রশ্ন। কিন্তু সে কথা পরে। আন্তরিকতার উষ্ণতায় মুহূর্তে ঘুচে গেল অপরিচয়ের ব্যবধান। শেখ সাহেব বললেন স্বভাবসিদ্ধ বিনিময়ের সঙ্গে দাদা আপনারা বহু সংগ্রামের পোড় খাওয়া নেতা। আপনারা পথ নির্দেশ দিন কিভাবে আন্দোলন শুরু করা যায়। সামরিক শাসন দেশটাকে ছারখার করে ফেলল। প্রতিবাদের পথ বন্ধ করে দিয়ে পাঞ্জাবি বিগ বিজনেস লুটে নিয়ে যাচ্ছে বাংলার সম্পদ। সোনার বাংলা আজ শ্মশান। এ অবস্থা চলতে দেয়া যায় না। দেশের মানুষও তৈরি। শুধু সাহস করে ডাক দেয়ার অপেক্ষা।

মণি সিংহ বললেন, আপনারা যুবক। দেশের ভবিষ্যৎ আপনাদের হাতে। মানুষ আপনাদের দিকেই তাকিয়ে আছে। তরুণ সমাজকেই সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে। নেতৃত্ব নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। তবে বুড়ো বলে বাতিল করে দেবেন না। আমরাও আছি আপনাদের তরুণদের মিছিলে। একটু থেমে পরিহাস তরল কণ্ঠে বললেন, জানেন তো, আমি কিন্তু বুড়োর দলে পড়তে রাজি নই। তা যখনই কেননা চুল পাকুক আর টাক পড়ুক। সবাই হেসে উঠলেন। মণি সিংহ'র ছিল মাথাজোড়া চকচকে টাক। সেদিন বৈঠক চলেছিল প্রায় দু-আড়াই ঘন্টা। দেশের পরিস্থিতির সামগ্রিক পর্যালোচনা করে উভয় পক্ষ একমত হন, আইয়ূবশাহীর বিরুদ্ধে অবিলম্বে একটা ব্যাপক ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন গড়ে তোলা দরকার। আলোচনা হয় অত্যন্ত খোলামেলা ও সোহার্দ্যপুর্ণ পরিবেশে। উভয়পক্ষের মনে পরস্পরের সদিচ্ছাও আন্তরিকতা সম্পর্কে সৃষ্টি হয় গভীর আস্থা। এ পারস্পারিক শ্রদ্ধাবোধ ও আস্থা উত্তরকালে পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন এবং

আওয়ামী লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী ঐক্যের বুনিয়াদ গড়ে তোলে। এভাবে মোট পাঁচটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ সব বৈঠকের ভেতর দিয়ে আইয়ুব বিরোধী গণআন্দোলনের পরিকল্পনা চূড়ান্ত হয়। শেষ পর্যন্ত সামরিক শাসনের অবসান, বন্দিমুক্তি, স্বায়ত্তশাসন, সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়া প্রভৃতির ভিত্তিতেই আন্দোলনের কর্মসূচী স্থির করা হয়। এর ভিত্তিতেই ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের মধ্যে সমঝোতা গড়ে উঠে এবং ৬২'-র ছাত্র আন্দোলন দানা বেধে ওঠে। শুধু ৬২'-র ছাত্র আন্দোলন নয় পরবর্তীকালে ছয় দফা আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থন, ছাত্রদের এগারদফা কর্মসূচী রচনা ও তার ভিত্তিতে ঐক্যদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা-উত্তরকালে দেশ গড়ার কাজে দুই দলের সহযোগিতামূলক নীতি-এসবের পেছনে ওই বৈঠকের প্রভাব কিছু না কিছু ছিল বললে বাড়িয়ে বলা হবে না।" দীর্ঘ ২০ বছর হুলিয়া মাথায় নিয়ে আত্মগোপনে থাকার পর ১৯৬৭ সালে কমরেড মণি সিংহ গ্রেফতার হন। জেলে থাকা অবস্থায় তিনি ১৯৬৮ সালের অক্টোবরে অনুষ্ঠিত পার্টির চতুর্থ সম্মেলনে (যা ঘোষিত হয়েছিল পার্টির প্রথম কংগ্রেস হিসেবে) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন।

সাথে একই দিনে কারাগারের বাইরে প্রকাশ্য জনতার সামনে উপস্থিত হয়ে পূর্ণগণতন্ত্র এবং শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে শরিক থাকার শপথকে নতুন ভাবে সোচ্চার করে তোলেন।" ঐ বছরই ২৫ মার্চ পুনরায় সামরিক আইন জারী হলে তিনি আবার আত্মগোপনে চলে যান। আত্মগোপন অবস্থায় ঐ বছরই জুলাই মাসে আবার তিনি গ্রেপ্তার হন।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে বন্দীরা রাজশাহী কারাগার ভেঙ্গে তাকে মুক্ত করে। জেল থেকে বেরিয়ে তিনি মুক্তিযুদ্ধে শরিক হন। মুক্তিযুদ্ধের সময় মণি সিংহ কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে বাংলাদেশ সরকারের উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হন। **আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের রাজনৈতিক, কুটনৈতিক সমর্থন, সাহায্য সহযোগিতা আদায়ে কমরেড মণি সিংহের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টির অবদান ছিল অবিসম্বাদিত। স্মরণ করা যেতে পারে যে ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট পদগোর্ণী আন্তর্জাতিক নেতাদের মধ্যে সর্ব প্রথম এক চিঠিতে পাকিস্তানের তদানিন্তন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধের আহ্বান জানান। সেভিয়েত ইউনিয়ন জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে তিন তিন বার পাকিস্তান কনফেডারেশন গঠনের মার্কিন প্রস্তাবে ভেটো প্রদান করে। পরবর্তীতে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা রাশিয়ান একে-৪৭ রাইফেল নিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করে। মুক্তিযুদ্ধের শেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের পক্ষে তার সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগরে প্রেরণ করতে চাইলে সোভিয়েত ইউনিয়ন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে তার ৬ষ্ঠ নৌবহর প্রেরণের কথা ঘোষণা করে। এ পরিস্থিতিতে মার্কিন**

যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গোপসাগরে সপ্তম নৌবহর প্রেরণের সিদ্ধান্ত বাতিল করে। কমরেড মণি সিংহ স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ভারতের প্রায়ত প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে দেখা করে কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাপের সম্মিলিত মুক্তি বাহিনী সংগঠিত করার কাজে সমর্থন আদায়ে সক্ষম হন। এর ভেতর দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের পাঁচ হাজার কর্মী মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মণি সিংহ সপরিবারে দূর্গাপুরে আসেন। এই প্রেক্ষিতে দূর্গাপুর ডিগ্রী কলেজ মাঠে স্মরণাতীত কালের এক বৃহত্তম জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় কমরেড মণি সিংহ বলেন,"অত্যাচারী পাকিস্তানী শোষক গোষ্ঠী পার্টির নেতা কর্মীদের উপর জেল জুলুম নির্যাতন চালিয়ে পার্টিকে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ভেতর দিয়ে ঐ অত্যাচারী শোষক গোষ্ঠী পরাজিত হয়েছে, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কমিউনিস্ট পার্টি জনগণের সমর্থনে বেচে আছে এবং মেহনতী মানুষের সংগ্রামের ঝান্ডাকে উচুতে তুলে ধরে দৃপ্ত পদক্ষেপে আগামী দিনের দিকে অগ্রসর হয়ে যাচ্ছে। তিনি বাংলাদেশ বিশ্বে আর একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসেবে আবির্ভূত হবে বলে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।"

স্বাধীনতার পরে ১৯৭৩ সালে অনুষ্ঠিত পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে এবং ১৯৮০ সালে অনুষ্ঠিত তৃতীয় কংগ্রেসে মণি সিংহ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর কমিউনিস্ট পার্টি আবার বেআইনী ঘোষিত হয়। ঐ সময়ে আজীবন সংগ্রামী এ নেতা আবার রাজনৈতিকভাবে নির্যাতিত হন ও কারা বরণ করেন। মণি সিংহ বিভিন্ন কথপোকথনে উলেখ করেছিলেন যে ঃ

১৯৭৭ সালে মাঝামাঝি সময় একদিন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান কমরেড মণি সিংহ'কে প্রাতঃরাশের আমন্ত্রণ জানান। ঐ বৈঠকে তৃতীয় বিশ্বের দেশে সেনাবাহিনীর ভূমিকা নিয়ে কিছু আলোচনা হয়। তাছাড়া প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান কমরেড মণি সিংহকে তাঁর আত্মজীবনী লেখার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু পরদিন ভোর রাতে কমরেড মণি সিংহকে নিবর্তন মূলক আইনে গ্রেপ্তার করে বিনা বিচারে ছয় (৬) মাস অন্তরীণ রাখা হয়। সেই সময়ে তার বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর।

ব্যক্তিগত জীবনে কমরেড মণি সিংহ ছিলেন অনারম্বর সাদামাটা জীবনের অনুসারী। কমরেড অণিমা সিংহ ছিলেন কমরেড মণি সিংহের সহধর্মিনী। তরুণ বয়সে সিলেটে মেডিকেল স্কুলের ছাত্রী থাকা অবস্থায় তিনি বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন ও কমিউনিস্ট আন্দোলনে যুক্ত হন। তিনি কৃষক নেত্রী ছিলেন। টংক আন্দোলনের সময় তিনি ঐ আন্দোলনে যোগদান করেন। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে তিনি কমরেড মণি সিংহের সাথে

আত্মগোপন অবস্থায় ছিলেন। আত্মগোপন থাকাকালীন অবস্থায় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এম.এ ডিগ্রী লাভ করেন। স্বাধীনতার পর তিনি কৃষক সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদিকা নির্বাচিত হন। ১৯৮০ সালের ১লা জুলাই মাত্র ৫২ বছর বয়সে এক সড়ক দুর্ঘটনায় তিনি মারা যান।

১৯৮৪ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি কমরেড মণি সিংহ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তখন থেকে ১৯৯০ সালের ৩১ ডিসেম্বর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত শয্যাশায়ী ছিলেন। ৮৪ বছর বয়স

মণি সিংহ সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্ডার অব ফ্রেন্ডশিপ অব পিপলস-এ ভূষিত

সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম সোভিয়েতের সভাপতি মন্ডলী (প্রেসিডিয়াম) বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি কমরেড মণি সিংহকে "অর্ডার অব ফ্রেন্ডশিপ অব পিপলস"-এ (জাতিসমূহের বন্ধুত্ব-প্রতীক সম্মান) ভূষিত করেছেন। ২৮শে জুলাই, ১৯৮০ জননেতা কমরেড মণি সিংহের ৮০তম জন্ম দিবসে তাঁকে এ সম্মান দেওয়া হয়। ঐ দিন সকাল ১১টায় বাংলাদেশে নিযুক্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত ই স্তেপানভ পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এসে পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে মণি সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সুপ্রীম সোভিয়েতের সভাপতিমন্ডলীর উক্ত সিদ্ধান্তের কথা জানান। রাষ্ট্রদূত সভাপতিমন্ডলীর নিম্নোক্ত ডিক্রী পড়ে শোনান ঃ

"শান্তি, গণতন্ত্র ও সমাজ-প্রগতির সংগ্রাম এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে মৈত্রী সুদৃঢ়করণে আপনার অবদান ও আপনার আশিতম জন্ম দিবস উপলক্ষে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের ইউনিয়নের সুপ্রীম সোভিয়েতের সভাপতিমন্ডলীর ডিক্রী বলে, কমরেড মণি সিংহ, 'আপনাকে অর্ডার অব ফ্রেন্ডশিপ অব পিপলস-এ ভূষিত করা হল'।"

পর্যন্ত সক্রিয় ভাবে তিনি পার্টির দায়িত্ব পালন করেছেন।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক সত্যেন সেন লিখেছেন ঃ

"মণি সিংহ'র সংগ্রামী জীবনকে আমরা এককভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেখি না। মণি সিংহের মধ্যে আসলে জনগণের জীবনী অভিব্যক্তি পেয়েছে। মণি সিংহের সংগ্রামী জীবনের শিক্ষা জনগণের সংগ্রামী জীবনের শিক্ষা। মণি সিংহের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অগণিত নামী ও বেনামী মেহনতি মানুষের আশা-আকাঙ্খা, ত্যাগ-তিতিক্ষার সংগ্রাম। মণি সিংহের অতীত জীবনকে জানার মধ্য দিয়ে জনসাধারণ নিজেদের অতীতকে দেখতে পাবেন। "

মণি সিংহ'র মৃত্যুর পর কমিউনিস্ট পার্টির শোক প্রস্তাবে (একতা, ৪ঠা জানুয়ারি, ১৯৯১) যেভাবে মূল্যায়ন করা হয় তার কিছু অংশ এখানে তুলে দেয়া হল ঃ

"বাংলাদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলন ও কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসের সঙ্গে কমরেড মণি সিংহের নাম ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। তিনি সেই প্রজন্মেরই একজন অগ্রণী মানুষ যারা এই দেশে শোষণ থেকে মুক্তির ভাবাদর্শ কমিউনিজমের পতাকা বহন করে এনেছেন। নব্বই বছরের আয়ূষ্কালে সত্তর বছর দেশমাতৃকার স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, শোষিত-নির্যাতিত মেহনতী মানুষের মুক্তি, শোষণহীন সমাজ তথা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং জনগণের কল্যাণ ও বিশ্বশান্তির সুমহান লক্ষ্যকে জীবনের ধ্রুবতারা করে শত বাধা বিঘ্নকে তুচ্ছ করে একনিষ্টভাবে বিরামহীন সংগ্রাম চালিয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে মণি সিংহ এক বিরল ব্যক্তিত্বের আসনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পঞ্চাশ থেকে আশির দশক পর্যন্ত বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সামগ্রিক সংগ্রামের পুরোভাগে ছিলেন মণি সিংহ। তার নামটিই হয়ে উঠেছিল সংগ্রামের প্রতীক। এবং এই প্রতীকই নতুন প্রজন্মকে আকৃষ্ট করেছিল কমিউনিজমের আদর্শের দিকে। মণি সিংহের জীবনে অভিব্যক্ত হয়েছে একটি ঐতিহাসিক কাল এবং সেই কালের ঐতিহাসিক দায়িত্ব তিনি সর্বোচ্চ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। কেন্দ্রীয় কমিটি ও আমাদের সমগ্র পার্টি মণি সিংহের মহান স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছে।

শোষন মুক্তির আদর্শ ও বিপ্লবের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা, গভীর দেশপ্রেম, মানবপ্রেম, গরিব-দুঃখী শোষিত-নির্যাতিত মেহনতী মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা, আত্মত্যাগ, সততা সাহস, সবলতা, লড়াকু মনোভাব, কথা ও কাজের সমন্বয় সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন মনোভাব জনগণের মধ্যে শ্রমসাধ্য কাজ, বিপবী শৃঙ্খলাবোধ প্রভৃতি মহৎ গুণাবলীর সমাহার ঘটেছিল মণি সিংহের ব্যক্তিত্বে। শত উত্থান পতনের মধ্যেও তাঁর কঠোর সময়ানুবর্তিতা নিয়মানুবর্তিতা অবিস্মরণীয়। মণি সিংহের ৮০তম জন্ম দিনে কেন্দ্রীয় কমিটি তাকে, "আমাদের পার্টির বিপ্লবী ঐতিহ্যের প্রতীক" বলে অভিহিত করেছিল। কেন্দ্রীয় কমিটি তা পুনর্ব্যক্ত করছে। জীবনব্যাপী বিপ্লবী সাধনার মধ্য দিয়ে মণি সিংহ তাঁর উত্তরপুরুষের সকল দেশপ্রেমিক, বিপ্লবী ও মানব-প্রেমিকদের জন্য রেখে গেছেন অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। তার সাদামাটা জীবন-যাপন সকল সৎ ও দেকপ্রেমিক মানুষের জন্য আদর্শ স্থানীয়। সকল দলমতের মানুষের কাছেই একজন সত্যনিষ্ঠ, আদর্শবাদী সর্বজনশ্রদ্ধেয় রাজনৈতিক নেতার আসন তিনি লাভ করেছেন। মণি সিংহের জীবন সংগ্রামের মহান শিক্ষা ও স্মৃতি আমাদের পার্টির অগ্রযাত্রায় অক্ষয় প্রেরণার উৎস্য। তাঁর বহন করা আদর্শের রক্ত পতাকা আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি, সমগ্র পার্টি ও সকল কমরেড সর্বশক্তি, মেধা, শ্রম ও রক্ত দিয়ে চিরসমুন্নত রাখার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করছে।"

চিরঞ্জীব মণিদা

দুর্গা প্রসাদ তেওয়ারী

কিংবদন্তির মহানায়ক, সুসং দুর্গাপুরের অহঙ্কার, সমাজ প্রগতির অগ্রদূত, শোষিত-বঞ্চিত মেহনতী মানুষের ভরসাস্থল প্রয়াত কমরেড মণি সিংহের প্রয়াণ দিবস ৩১ ডিসেম্বর। টংক প্রথা আন্দোলনের স্মৃতি বিজড়িত সুসং দুর্গাপুরের টংক শহীদ স্মৃতি স্তম্ভের পাদপিঠে প্রতিবারের মত এবারও 'মণিদার' প্রয়াণ দিন থেকে সাত দিনব্যাপী কমরেড 'মণি সিংহ মেলা' শুরু হচ্ছে।

সমগ্র দেশ যখন আজ রাজনীতিসহ সর্বক্ষেত্রে বিভাজিত তখন 'মণি মেলা'- কে ঘিরে এদেশের এ প্রত্যন্ত অঞ্চলটি হয়ে উঠে এক জনঐক্যের প্রতীক। দলমত নির্বিশেষে সকলের যৌথ উদ্যোগে ও প্রচেষ্টায় এই মেলা আয়োজিত হয়। 'মণিদা' এখানে সকলের উর্ধ্বে। তার আদর্শ, ত্যাগ-তিতিক্ষা, সত্য-নিষ্ঠা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান সবকিছুই 'মণিদা'-কে সংকীর্ণ বিভেদের উর্ধ্বে দাঁড় করিয়েছে। টংক আন্দোলনের ব্যাপক, বিশাল, সশস্ত্র অভ্যুত্থান যারা চাক্ষুষ দেখেছেন এমন লোকের সংখ্যা এই জনপদে খুবই কম। এখনও যারা বেঁচে আছেন তাদের কাছ থেকে জানা যায়, কি বিশাল ঐক্যে সংগঠিত ছিল এই আন্দোলন। আমার সৌভাগ্য যে, আমি কৈশোর বয়সে তা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। সুসং মহারাজাদের ভাগ্নে ছিলেন তিনি। মামাদের বার বার অনুরোধ সত্ত্বেও পরিবারের বিপরীতে তাকে দাঁড় করাতে পেরেছিল তার ভিতরের শোষণ মুক্তির চিন্তা ও কমিউনিস্ট আদর্শের প্রতি দৃঢ় ও অবিচল অবস্থান। তিনি জানতেন, এর পরিণতিতে তার পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু ব্যক্তিগত ও পারিবারিক লাভ-ক্ষতির হিসাবের বাইরে এসে 'মণিদা' দাড়িয়েছিলেন হাজার হাজার শোষিত কৃষকের পক্ষে। যা আজ ইতিহাসের অংশ। 'মণিদা'র বাসা ও আমাদের বাসা পাশাপাশি ছিল। আন্দোলনের উত্তাল সময়ের নানা ঘটনা আমার চাক্ষুষ দেখার সুযোগ হয়েছিল। দশ বার হাজার নারী-পুরুষের শ্লোগান মুখরিত জঙ্গি মিছিল সুসং দুর্গাপুর প্রদক্ষিণ করতো-তাদের মুখে "জান দিব তবু ধান দিব না", "টংক প্রথা উচ্ছেদ চাই", "জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ চাই"। আমার মানসপটে আজও সেই সব দৃশ্য ভেসে উঠে। 'মণিদা'র বিরল সাংগঠনিক ক্ষমতার কথা মনে হলে শিহরণ তৈরি করে। প্রায় বিছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে এমন সু-সংগঠিত আন্দোলনকে সফলতার রূপ দেয়া, যা তত্কালীন ব্রিটিশ ভারতকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল, তা মণিদারই বিচক্ষণ নেতৃত্বের প্রকাশ।

পরবর্তীতে ১৯৪৭ সনে উপমহাদেশের ভৌগোলিক বিভাজন, হিন্দুস্থান-পাকিস্তানে রূপ নেয়া এই ভূখন্ডে শোষিত-বঞ্চিত মানুষের অধিকার আন্দোলনগুলো হোঁচট খায়। মানুষজন সাময়িক মহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। সাম্প্রদায়িক পাকিস্তান সরকারের ব্যাপক নির্যাতন, নিপীড়ন ও পরিশেষে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের মাধ্যমে শেষ হয় এই আন্দোলন। বর্ণনাতীত নির্যাতনের শিকার এর সংগঠক কর্মিগণ, বাধ্য হন দেশান্তরী হতে। তৎকালীন নূরুল আমীন সরকার কি নির্মমভাবে মণিদার বাসা-বাড়িকে বিরাণ ভূমিতে পরিণত করেছিলেন, উচ্ছেদ হতে হয়েছিল সমস্ত পরিবারকে, মণিদাকে আত্মগোপনে যেতে হয়। মহান মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে সমগ্র কমিউনিস্ট বিশ্ব, তথা তৎকালীন বৃহৎ পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নকে (বর্তমান রাশিয়া) আমাদের মুক্তিসংগ্রামের সপক্ষে দাঁড় করাতে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছিলেন। গড়ে তুলেছিলেন কমিউনিস্ট পার্টি-ন্যাপ-ছাত্র ইউনিয়নের সমন্বয়ে এক বিশাল গেরিলা বাহিনী। যা আমাদের স্বাধীনতাকে সফলতার দিকে বেগমান করে তুলেছিল।

আমার পরম সৌভাগ্য এই মহাপুরুষটির আমি স্নেহলাভের সুযোগ পেয়েছিলাম। মণিদা ও বউদি ১৯৭২-১৯৮০ যতবারই সুসং দুর্গাপুরে এসেছেন আমি তাদের আতিথ্য দেয়ার সুযোগ পেয়েছি। আমার কৈশোর বয়সের মানস পটে মণিদার আদর্শ যে আদর্শিক রেখা টেনে ছিল আজও তার অবিচল বিশ্বাস নিয়ে চলেছি। ১৯৯০-এর স্বৈরাচার মুক্ত দেশে ৩১ ডিসেম্বর মণিদা আমাদের ছেড়ে পরলোক গমন করেন। তার শেষ শবযাত্রার সাথী ছিলাম। কালের চক্রে ৮১টি বছর কেটে গেল, অনেক স্মৃতি, অনেক ঘটনা মনে পড়ে। এমন সহজ-সরল নির্লোভ নেতার আজ বড় প্রয়োজন।

আমরা 'মণি মেলা'র মাধ্যমে, সাত দিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মণিদার জীবন দর্শন, আদর্শ বর্তমান প্রজন্মের নিকট প্রচারের চেষ্টা করি। আমার ঐকান্তিক বিশ্বাস, মণি মেলার দিন দিন বিশালতায় এই প্রমাণ করে যে, আগামী প্রজন্ম তার অতীত থেকে সত্যকে খুঁজে বের করে ধারণ করতে চায় নিজেদের জীবনে। সূর্যের আলোর মত সমস্ত অপশক্তির কালিমাকে পেছনে রেখে সত্যের উদ্ভাস হবেই, জয়ী হবে মেহনতী মানুষের আকাঙ্খা, গঠিত হবে শোষণমুক্ত সমাজ এটাই বিজ্ঞান। মেহনতী মানুষের জয় হোক, কমরেড মণি সিংহ লাল সালাম।

লেখক :
কমরেড মণি সিংহের ঘনিষ্ঠ সহচর
ও আহ্বায়ক, কমরেড মণি সিংহ মেলা উদযাপন কমিটি, সুসং দুর্গাপুর, নেত্রকোনা।

কমরেড মণি সিংহ, একজন আদর্শ বিপ্লবী

মনজুরুল আহসান খান

বিপ্লবী জননেতা কমরেড মণি সিংহ। আমাদের দেশের শোষিত-নিপীড়িত মানুষের মুক্তিসংগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা। আত্মত্যাগ, দৃঢ়তা, সততা, আদর্শ, নিষ্ঠা ও আপোসহীন সংগ্রামের এক মূর্ত প্রতীক। ৩১ ডিসেম্বর তার ১৯তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হচ্ছে। গোটা শতাব্দী ধরে শ্রমিক, কৃষক সাধারণ মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে লড়েছেন মণি সিংহ। লড়েছেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, সব রকম শোষণ, অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে, সমাজতন্ত্র–তার ভাষায় 'ইনসাফ' প্রতিষ্ঠার জন্য। প্রয়োজনে নিজের আত্মীয়-স্বজন, জমিদারতন্ত্রের বিরুদ্ধে, টঙ্ক শোষণের বিরুদ্ধে লড়তে কুণ্ঠিত হননি। সাধারণ মানুষের পক্ষে আপামর কৃষকের স্বার্থে তিনি ধারাবাহিক আন্দোলন সংগ্রাম চালিয়েছেন। কোনদিন তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেননি। ব্রিটিশ শাসকের কোপানলে পড়েছেন, নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, কারারুদ্ধ হয়েছেন। হুলিয়া মাথায় নিয়ে বছরের পর বছর আত্মগোপন করে থেকে সংগঠন ও আন্দোলন গড়ে তুলছেন। পাকিস্তান আমলে উগ্র সাম্প্রদায়িকতা, দ্বি-জাতিতত্ত্ব ও প্রতিক্রিয়ার প্রচন্ড নিপীড়ন উপেক্ষা করে মণি সিংহ সংগ্রামের কাফেলা এগিয়ে নিয়েছেন। কমিউনিস্ট পার্টি যখন নিষিদ্ধ, সমাজতন্ত্র যখন নিষিদ্ধ শব্দ, ধর্মান্ধতা যখন চরমে, যখন হাজার হাজার প্রগতিশীল কর্মী ভিটা মাটি ছেড়ে স্বজনদের নিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে যেতে বাধ্য হচ্ছেন, যখন কমিউনিস্টদের তারা করা হচ্ছে, জেলখানায় হত্যা করা হচ্ছে, যখন গণতন্ত্র ও প্রগতির ভবিষ্যত অন্ধকারাচ্ছন্ন, যখন অনেকেই হতাশাগ্রস্ত, হাল ছেড়ে দিয়েছেন তখন সিংহ-পুরুষ মণি সিংহ তার বিপ্লবী সহকর্মীদের নিয়ে এই ভূখন্ডে মাটি কামড়ে পরেছিলেন, পার্টির পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছিলেন, আমাদের দেশের প্রথম সশস্ত্র গণসংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। শত প্রতিকূলতার মধ্যেও গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার বাণী প্রচার করেছেন। পাকিস্তান আমলে হুলিয়া, সশস্ত্র অভিযান, ভিটামাটি জমিজমা ক্রোক কোন কিছুই এই সাহসী নির্লোভ মানুষটিকে বিচলিত করতে পারেনি।

বাংলাদেশের শ্রমিক কৃষক ও জনগণের সংগ্রাম, গণতন্ত্রের সংগ্রাম, জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম –সব কিছুর পুরোভাগে ছিলেন কমরেড মণি সিংহ। নিষ্ঠুর নির্যাতন ও দমন পীড়ন, নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে তিনি কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলেন, গড়ে তোলেন নানা গণ সংগঠন ও সংগ্রাম। দ্বি-জাতিতত্ত্ব, সাম্প্রদায়িকতা ও স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিরোধ গড়ে তোলেন তিনি। গণতান্ত্রিক চিন্তা চেতনা ও সংগ্রামের বিকাশে কমরেড মণি সিংহ ও কমিউনিস্ট পার্টি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে সেক্যুলার আওয়ামী লীগের জন্ম ও গণতান্ত্রিক সংগঠন ও আন্দোলনের জন্মেও তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ভাষা সংগ্রাম ও স্বাধিকার সংগ্রাম গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও

ছিল তার বিশাল অবদান। কঠিন অবস্থার মধ্যে হুলিয়া মাথায় নিয়ে নিরবচ্ছিন্ন ও জঙ্গি সংগ্রাম গড়ে তোলা এবং তার আত্মত্যাগ ও দৃঢ়তার মধ্য দিয়ে মণি সিংহ কিংবদন্তীর নায়কে পরিণত হন। বাংলাদেশের বহু তরুণ তাজাপ্রাণ গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তি তার দৃষ্টান্ত থেকে প্রেরণা লাভ করে। ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানের সময় যখন মণি সিংহ কারাগারে, তখন দেশের সর্বত্র যে অসংখ্য মিছিল হয়েছে তার প্রতিটি মিছিলে সেদিন শেখ মুজিবের নামের পাশাপাশি উচ্চারিত হয়েছে মণি সিংহের নাম। শোগান উঠেছে 'জেলের তালা ভাঙবো মণি সিংহকে আনবো', 'মণিরাজ মণি সিং লও লও লাল সালাম।' '৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের পর এক সভায় এই দূরদর্শী নেতা বাংলাদেশের রাজনীতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছিলেন, এখন এজেন্ডা (আলোচ্যসূচি) হচ্ছে সশস্ত্র সংগ্রাম। একথার জন্য অবশ্য তাকে কারো কারো সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। প্রবাসী সরকারের উপদেষ্টামন্ডলীর সদস্য ছিলেন। এ সত্ত্বেও স্বাধীন দেশে মণি সিংহ সরকারের কোপানল থেকে রক্ষা পাননি। কয়েকবার তাকে কারাবরণ করতে হয়েছে এবং আত্মগোপনে থাকতে হয়েছে। মণি সিংহ ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির স্বাভাবিক নেতা। দেশ স্বাধীন হওয়ার সময় মণি সিংহ শুধু কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। কিন্তু দেশে-বিদেশে অধিকাংশ লোক তাকেই মূল নেতা মনে করতেন এবং সেভাবেই সম্মান দিতেন। অনেকেই তাকে পার্টির সভাপতি হিসেবে সম্বোধন করে চিঠি দিতেন। বঙ্গবন্ধু সরকার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাকে সভাপতি হিসেবে আমন্ত্রণ জানাতেন। এমতাবস্থায় ১৯৭৩ সালে কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে গঠনতন্ত্র সংশোধন করে পার্টির সভাপতির পদ সৃষ্টি করা হয়। অবশ্য প্রস্তাবিত গঠনতন্ত্রে সভাপতি সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য ছিলেন না। পরে অবশ্য কংগ্রেস হল থেকে সভাপতিকে সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য করার জন্য সংশোধনী আসে এবং তা সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয়ে যায়। বস্তুত জনগণই মণি সিংহকে কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি পদে বসিয়েছিলেন। এটা একটা বিরল ঘটনা। কমরেড মণি সিংহ রাজনীতিতে ভুল-ত্রুটি করেননি এমন নয়। কিন্তু তিনি যা করেছেন সরল মনে সততা ও ঐকান্তিকতার সঙ্গে মনপ্রাণ দিয়ে করেছেন। দৃঢ়তা ও সাহসের সঙ্গে করেছেন। এটাই ছিল তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। যেমন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপর যে বাম হঠকারিতা হয়, ময়মনসিংহের গারো পাহাড়ের পাদদেশে যে হাজং বিদ্রোহ ও সশস্ত্র সংগ্রামে তিনি নেতৃত্ব দেন, তা ছিল এক হিসেবে হঠকারী ও ভুল। সর্বভারতীয় পার্টির সিদ্ধান্ত অনুসারে এই সংগ্রাম হয়েছিল। কৃষক, জনতার স্বার্থও তাতে নিহিত ছিল। এ সব সংগ্রামের মধ্য দিয়েই জমিদারতন্ত্রের অবসান ঘটে। নিজের ভুল অকপটে স্বীকার করার মতো সাহস ও সরলতা এই মহান পুরুষের ছিল।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে মণি সিংহের সক্রিয় রাজনীতির শেষ দিন পর্যন্ত

তাঁকে খুব কাছে থেকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তিনি পার্টির ফোরামে অকপটে এবং সাহসের সঙ্গে তার মতামত ব্যক্ত করতে কখনো দ্বিধা করেননি। অপরদিকে মতভিন্নতা সত্ত্বেও তিনি পার্টির সিদ্ধান্ত মেনে চলেছেন। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে অনেক বিষয়ে গুরুতর মত পার্থক্য তিনি ব্যক্ত করেছেন। তার মত অনেক সময় পার্টিতে গৃহীত হয় নাই। সাধারণভাবে একথা বলা যায়, বাংলাদেশের ঘটনাবলী ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস একথা প্রমাণ করেছে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মণি সিংহের বক্তব্যই ছিল সঠিক। পরবর্ত্তীতে পার্টিতে যে মূল্যায়ন হয়েছে তাতেও আমরা তা স্বীকার করে নিয়েছি।

বঙ্গবন্ধুর আমলে কমিউনিস্ট পার্টির ঐক্যের নীতি সঠিক হলেও আওয়ামী লীগের ত্রুটি-বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সিপিবি যথেষ্ট সংগ্রাম করেনি। তৃতীয় কংগ্রেসে পার্টি এ ব্যাপারে আত্মসমালোচনা করে। কমরেড মণি সিংহ পার্টিকে আওয়ামী সরকারের ত্রুটি-বিচ্যুতির বিরুদ্ধে জোরদার সংগ্রামে নামাবার জন্য পার্টির ভেতর সচেষ্ট ছিলেন। বাকশাল করার সময়ও মণি সিংহ এক জটিল ও কঠিন অবস্থায় পার্টির মধ্যে বাকশালের তীব্র বিরোধিতা করেন। মণি সিংহকে বাকশালের কেন্দ্রীয় কমিটিতেও নেওয়া হয়নি। অবশ্য মোহাম্মদ ফরহাদ বাকশাল কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হন। মণি সিংহের মতো নেতাও সেদিন পার্টির শৃঙ্খলা মেনে কর্মী ও সমর্থকদের সঙ্গে মিছিল করে বাকশাল অফিসে গিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু উপরে বারান্দায় দাড়িয়ে অভিবাদন গ্রহণ করেছিলেন। তিনি অবশ্য 'মণিদা'কে ডেকে উপরে নিয়ে গিয়েছিলেন। জিয়ার আমলে পার্টির দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে কমরেড মণি সিংহ দৃঢ়ভাবে সংগ্রাম করেছেন। এজন্য তাকে খুব চাপের সম্মুখীন হতে হয় এবং কখনো কখনো হেনস্তা হতে হয়। মণি সিংহ জিয়াকে 'হ্যাঁ' ভোট দেয়ার ব্যাপারে পার্টির সম্পাদকমন্ডলীর সিদ্ধান্তের ঘোরতর বিরোধিতা করেন। কিন্তু পার্টি শৃঙ্খলার কারণে তিনি ভোট কেন্দ্রে গিয়ে 'হ্যাঁ' ভোট দেন। বাইরের মানুষ এটাই দেখেছেন, ভেতরের কথা তারা জানতেন না।

কিন্তু সেদিন 'হ্যাঁ' ভোটের প্রশ্নে অথবা বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে মণি সিংহের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল খুবই পরিষ্কার। কোন কিছুই তাকে টলাতে পারেনি। কমরেড মণি সিংহ-আমাদের 'বড়ভাই'র সঙ্গে অধিকাংশ সময় মতের মিল হলেও মাঝে মধ্যে তার সঙ্গে আমার প্রচুর বিতর্ক হতো। তখন তার বাসা আমাদের বাসার কাছে ছিল। প্রায়ই সকালে তিনি আমাদের বাসায় চলে আসতেন। আমার বাসা থেকে জরুরি টেলিফোন করতেন আর আমার সঙ্গে চলত নানা বিষয়ে বিতর্ক। তিনি প্রশ্রয় দিতেন। আমারও অনেক বিষয় পরিষ্কার হতো। কিন্তু মণি সিংহ ছিলেন তার মতে অটল। ব্যক্তিগত সম্পর্ক, পছন্দ-অপছন্দ এসবকে তিনি রাজনীতির ব্যাপারে টানতে প্রস্তুত ছিলেন না। তার সঙ্গে মতভেদ বা কোনো কোনো বিষয়ে ভিন্নমত কখনও কোন কমরেডের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা কমরেডশিপকে স্পর্শ করতে পারেনি। এখানেই ছিল মণি সিংহের মহত্ব।

বড়ভাই–হ্যাঁ, আত্মগোপন অবস্থায় পার্টির মধ্যে টেক্‌নাম হিসাবে মুখে মুখে বড় ভাই বলেই সব কমরেডরা ওই নামেই ডাকতেন। তিনি কোন সভায় দেরি করে এসেছেন অথবা কোথাও যত ছোট কাজই হোক সময় দিয়ে সময় রক্ষা করেননি, এমন ঘটনা আমাদের জানা নেই। নিজের ঘড়িটা নিয়মিত রেডিওর সঙ্গে মিলিয়ে নিতেন। অন্যের ঘড়ির সময় ঠিক করে দিতেন। এ নিয়ে কারো প্রশ্ন করার উপায় ছিল না। আমাদের জন্য "মণি সিং স্টান্ডার্ড টাইম" অর্থ ছিল সঠিক সময়।

মণি সিংহের সততা ও সরলতা ছিল অতুলনীয়। কোন রকম দুর্নীতি বা কূটকৌশল তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না। এখানেও দু'একটি ঘটনা উল্লেখ করার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। বঙ্গবন্ধুর আমলে একবার আমাদের পার্টি সমাবেশে কর্মীদের খাওয়াবার ব্যবস্থা করা হয়। তখন খোলাবাজারের তুলনায় রেশনের চাউলের দাম বেশ কম। বড়ভাই পারমিট জোগাড় করে দিলেন। কিন্তু সমাবেশ শেষে দেখা গেল বেশকিছু পরিমাণ চাল বেচে গেছে। খোলা বাজারে সেই চাল বিক্রি করে প্রচুর লাভ হতে পারত। কমরেড মণি সিংহ চাল বেচে গেছে জানার সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ দিলেন, এ চাল সরকারকে ফেরৎ দিতে হবে। বড়ভাই আমাকে নিয়ে সোজা চলে গেলেন খাদ্যমন্ত্রীর অফিস কক্ষে। তখন খাদ্যমন্ত্রী ফনী ভূষণ মজুমদার। সব শুনে ফনি বাবু তখন খাদ্য বিভাগের একজন পুরনো অফিসারকে ডেকে পাঠালেন। অফিসারটি ছিলেন আমার বাবা আব্দুল ওয়ারেস খান। তিনি তখন খাদ্য বিভাগের মহাপরিচালক। আমার বাবা কাগজপত্র ঘেটে বললেন, কোনো সময় পারমিটের চাল নিয়ে ফেরৎ দিয়েছে এমন ঘটনার সম্মুখীন তাদের হতে হয়নি। এমন কোন নিয়মও তিনি খুজে পাচ্ছেন না।

ফনি বাবু মৃদু হেসে বললেন, 'ওয়ারেস সাহেবের মতো পুরান লোক যখন চাল ফেরৎ নেয়ার নিয়ম খুজে পাননি, আর কেউ পাবেন না। মণি দা আপনি বরং চাল নিয়ে গরীব কর্মীদের রেশন দরে বিক্রি করে দেন। আপনার ওপর আমার বিশ্বাস আছে।' বড় ভাই এরপরও কিছু পীড়াপীড়ি করলেন। কিন্তু উপায় নেই। আমরা ফিরে এলাম। রাতে বাড়ি ফেরার পর বাবা ডেকে পাঠালেন। বললেন, তোমরা চলে আসার পর জান ফনি বাবু কি বললেন? উনি বললেন, "দেখুন সত্যিকার নেতা কাকে বলে, সততা কাকে বলে, সত্যিকার পার্টি কাকে বলে। এরকম আরও নেতাকর্মী ও পার্টি পেলে সোনার বাংলা গড়ে তুলতে আমাদের কোন অসুবিধা হতো না"। বুঝলাম বাবার নিজের মনের কথাও তাই। তিনি মনে মনে খুব খুশী হয়েছেন। কিছুটা গর্ববোধ করছেন।

বড় ভাইয়ের ঘরে যখন টেলিফোন লাগল তখন আর এক সমস্যা দেখা দিল। তিনি প্রতিটি ফোনকলের হিসাব রাখতেন। আত্মগোপন অবস্থায় পাই-পয়সার হিসাব টুকে রাখতেন বলে তাকে নিয়ে অনেকে ঠাট্টা করতেন। টেলিফোনের বিল বেশি হলে হুলস্থুল শুরু করতেন। অনেক সময় নিজেও টেলিফোন অফিসে যেতেন। মেশিনের হিসাব

ভুল হতে পারে, মণি সিংহের হিসাব ভুল হতে পারে না। মিথ্যা বলার তো প্রশ্নই আসে না। এই সরল সত্যবাদী অথচ দৃঢ় শিশুটির সামনে টেলিফোনের কর্মচারীরা কি রকম অসহায় হয়ে পড়তো একবার ভেবে দেখুন। এরপর একবার ফোনে বিল হলো কম। চললেন মণি সিংহ, হাতে বিল, কবে কখন কতো নম্বরে ফোন করেছেন তার তালিকা এবং সঙ্গে বিলের টাকা এবং যে পরিমাণ টাকা কম বিল হয়েছে সে টাকা। মেশিনে ভুল হতে পারে, মণি সিংহের ভুল নেই। ফোনের বিল কম হয়েছে, এই নিন বাড়তি টাকা। টেলিফোন অফিসের কর্মচারীদের চক্ষু ছানাবড়া। আমরা যারা আজকের 'বাস্তবতা' বুঝি; যারা তাকে এসব 'পাগলামি' থেকে বিরত করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছি, তারা যেন কিছুটা বিব্রত, সেই সময়ে সেই সঙ্গে কি যে গৌরববোধ আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করেছে- তার সততা, সারল্য, চরিত্রের মহিমা আমাদের আবেগাপ্লুত করেছে। এই ছিলেন কমরেড মণি সিংহ- সৎ-সরল, আপোষহীন ও নিবেদিতপ্রাণ, আমাদের পার্টির সভাপতি, আমাদের কালের বিবেক, আমাদের অহঙ্কার। আমার আজও মনে পড়ে কমরেড মণি সিংহ বঙ্গবন্ধুকে বলেছিলেন, সংবিধানে বর্ণিত চার মূলনীতির সাথে আর একটি যোগ করতে হবে, 'সততা।' তা না হ'লে সব নীতিই ভেস্তে যাবে। আজ আমরা তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি।

লেখক:
মনজুরুল আহসান খান, উপদেস্টা, কেন্দ্রীয় কমিটি
বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি

কমরেড মণি সিংহের শিক্ষা

এম এম আকাশ

বাংলাদেশের রাজনীতি এখন সহিংস সংঘাতে ভরপুর। একদিকে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি ও সাধারণ মানুষ; অন্যদিকে রয়েছে মৌলবাদী এবং যুদ্ধাপরাধীদের সমর্থক সন্ত্রাসী রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামী ও তাদের সমর্থকেরা। এই সংঘাতে বিজয় অর্জিত না হলে বাংলাদেশ পুনরায় ৪২ বছর পিছিয়ে পাকিস্তানি বাংলাদেশে পরিণত হবে। যদিও সেটি হওয়া সহজ নয় বলেই আমি এখনো বিশ্বাস করি।

এখন আওয়ামী লীগ ও জামায়াত উভয়ের দ্বন্দ্ব চরম বৈরিতামূলক দ্বন্দ্বে পরিণত হয়েছে। এই বিশেষ সন্ধিক্ষণে গণতন্ত্র ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রশ্নে কমরেড মণি সিংহের কাছ থেকে তার অনুসারী আমরা কী শিক্ষা পেতে পারি, তা নিয়েই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। প্রথমে দেখা যাক, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন কমরেড মণি সিংহ জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজন সম্পর্কে কী বলেছিলেন। স্বাধীনতাযুদ্ধের দলিলপত্রে মণি সিংহের

দেওয়া সাক্ষাৎকার থেকে এ বিষয়ে আমরা জানতে পারব। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরের নির্বাচন সম্পর্কে কমরেড মণি সিংহ তার সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'নির্বাচনের ফলাফল মূল্যায়ন করে আমরা (কেন্দ্রীয় কমিটি) আরও দেখেছিলাম যে, আওয়ামী লীগ কেবল "পূর্ব পাকিস্তানের" জনগণেরই সর্বাত্মক সমর্থন পায়নি, তৎকালীন পাকিস্তানের সরকার গঠনের অধিকার লাভ করেছে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলো এবং এই শাসকদের মদদদাতা সাম্রাজ্যবাদ কিছুতেই নির্বাচনের এই ফলাফল মেনে নেবে না এবং তা বানচাল করার ষড়যন্ত্র করবে। এ অবস্থায় বাংলাদেশ স্বাধীনতাসংগ্রামের দিকেই অগ্রসর হবে এবং সে জন্য জনগণকে প্রস্তুত করা দরকার।'

পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ সেদিকে এগিয়ে গেলে পাকিস্তানের দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মভিত্তিক দল ও শক্তিগুলো পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বন করে। এই মুষ্টিমেয় অংশকে বাদ দিয়ে স্বাধীনতার প্রশ্নে ব্যাপক জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার প্রশ্ন ১৯৭১ সালে সামনে চলে আসে। তখন বামপন্থীদের মধ্যে দুটি মত বিরাজ করছিল, একটি মত ছিল আওয়ামী লীগের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করা। অপর মতটি মুক্তিযুদ্ধকে দেখছিল 'দুই কুকুরের লড়াই' হিসেবে। এই দ্বিতীয় মতটি 'পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী' এবং 'মুক্তিযোদ্ধাদের বাহিনী' উভয়কেই সমশত্রু জ্ঞান করে সমদূরত্বের নীতির পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছিল।

স্বাধীনতার মতো 'জাতীয় ইস্যুতে' জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলে এগোনোর পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন কমরেড মণি সিংহ। 'জাতীয় ইস্যু'র বিপরীতে বামপন্থী অবস্থানকে তিনি 'বিভেদাত্মক' এবং 'ভ্রান্ত' বলে অভিহিত করেছিলেন।

'জাতীয় ঐক্যের' মধ্যে স্বভাবতই বাম ও ডানপন্থী উভয় প্রকার শক্তি বিদ্যমান থাকে। সেই জাতীয় ফ্রন্ট জনগণের কল্যাণে কতটুকু আসবে, তা সর্বদাই নির্ভর করে ফ্রন্টের ভেতরে শক্তি-ভারসাম্য ও নেতৃত্বের চরিত্রের ওপর। এ বিষয়টি সম্পর্কে কমরেড মণি সিংহ কি সজাগ ছিলেন না? তিনি কি 'জাতীয় ঐক্যের' অবস্থান নিতে গিয়ে জাতীয় ফ্রন্টের অভ্যন্তরে কমিউনিস্ট ও বামদের 'সংগ্রামের' দিকটিকে ভুলে গিয়েছিলেন বা তার ওপর জোর কম দিয়েছিলেন? এই প্রশ্নটি এখন আমরা বিচার করে দেখব। মণি সিংহ স্বাধীনতাযুদ্ধের দলিলপত্রে প্রদত্ত একই সাক্ষাৎকারের আরেক অংশে লিখেছেন, 'আমরা আওয়ামী লীগসহ স্বাধীনতার পক্ষের সব শক্তির বৃহত্তম জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে সচেষ্ট ছিলাম। এই প্রচেষ্টা তেমন সফল হয়নি। শেষের দিকে বাংলাদেশ সরকারের "পরামর্শদাতা কমিটি" গঠিত হয় এবং তাতে আমাদের পার্টির প্রতিনিধিরূপে আমি ছিলাম। সশস্ত্র সংগ্রামের অগ্রগতির পর্যায়ে আমাদের উভয় দলের দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য ছিল। আমরা স্বাধীনতাসংগ্রামকে কেবল জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতাম না।'

এই উদ্ধৃতি থেকে এটা স্পষ্ট যে কমিউনিস্টদের জাতীয় ঐক্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অর্থ জাতীয়তাবাদী হয়ে যাওয়া নয় বা আত্মসত্তা বিসর্জন দেওয়া নয়। নিজস্ব পৃথক বৈশিষ্ট্য ও পৃথক রণকৌশল বজায় রাখার শর্ত মেনে নিয়েই জাতীয় ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে হবে। এখানেই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন হচ্ছে, ওই 'জাতীয় ঐক্যের' সাংগঠনিক সুনির্দিষ্ট রূপটি কী রকম হবে? আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ, আওয়ামী লীগ, জাতীয় কংগ্রেস ও মওলানা ভাসানীকে (ব্যক্তি হিসেবে) নিয়ে গঠিত হয়েছিল ঢিলেঢালা 'পরামর্শদাতা কমিটি'। এ ছাড়া আওয়ামী নেতৃত্বাধীন গেরি-লা বাহিনীগুলোর সঙ্গে ন্যাপ-কমিউনিস্ট পার্টির গেরিলা বাহিনীর কাজের সমন্বয়ের জন্যও একটি 'কো-অর্ডিনেশন' কমিটি গঠিত হয়েছিল।

এ আলোচনা থেকে আমরা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষায় উপনীত হতে পারি। স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি বা ফ্যাসিবাদের মতো সুনির্দিষ্ট জাতীয় ইস্যুতে বামপন্থীদের সঙ্গে অন্যান্য শক্তির ব্যাপক ঐক্য গড়ে তোলার ঐতিহাসিক প্রয়োজন রয়েছে, কিন্তু সেই প্রয়োজনীয় ঐক্যের সুনির্দিষ্ট রূপ এমন হতে হবে, যাতে জাতীয় ইস্যুর সমর্থক বামপন্থীদের অন্যান্য উচ্চতর সংগ্রামগুলো চালানোর স্বাধীন সুযোগ ও অধিকার বজায় থাকে। তার মানে ঐক্যের মধ্যে পার্থক্য ও সংগ্রাম এবং সংগ্রামের মধ্যে ঐক্যের বা মিলের একটি যুগপৎতা ঘটিয়ে জাতীয় ইস্যু এবং শ্রেণীসংগ্রামের ইস্যুকে যুগপৎ অগ্রসর করে নিতে হবে। এই যুগপৎতার জটিল কৌশলেরই অনুমোদন আমরা কমরেড মণি সিংহের উল্লিখিত সাক্ষাৎকারে পাচ্ছি।

এই মহান নেতার ২৩তম মৃত্যুবার্ষিকীতে তাকে জানাই অন্তরের গভীরতম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

এম এম আকাশ: অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
akash92@hotmail.com

সাম্য মৈত্রীর মহান পুরুষ

দিলওয়ার হোসেন

বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসের সিংহপুরুষ মণি সিংহ। কিশোর বয়স থেকেই তিনি রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন। প্রথম জীবনে ব্রিটিশ বিতাড়ণ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যোগ দেন অনুশীলন দলে। সেখান থেকে গরিব ও মেহনতি মানুষের মুক্তির লড়াইয়ে নিজেকে নিয়োজিত করেন। মেহনতি মানুষের রাজনীতির সঙ্গে মণি সিংহের সংযুক্তি কলকাতার মেটিয়াবুরুজে শ্রমিক আন্দোলনের মাধ্যমে। তিনি মেটিয়াবুরুজে চটকল ও সুতাকল শ্রমিক ধর্মঘটে জনপ্রিয় শ্রমিক নেতায় পরিনত হন। সেখান থেকেই তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সফল সংগঠক হয়ে ওঠেন। মণি সিংহ বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শুধু প্রধান ভূমিকাই পালন করেননি হয়ে উঠেছিলেন বাম রাজনীতির প্রাণপুরুষ। বাংলাদেশের কৃষক আন্দোলন তো বটেই বলতে গেলে সমগ্র ভারতের কৃষক আন্দোলনের অগ্রণী নেতা। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী মণি সিংহ ও কমিউনিস্ট পার্টিকে দেশের শত্রু হিসেবে অভিহিত করেছিল। পাকিস্তানের ২৩ বছর আয়ুস্কালের প্রায় পুরো সময় তাকে জেলে অথবা আত্মগোপনে থাকতে হয়েছে।

মণি সিংহ জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯০০ সালের ২৮ জুলাই ময়মনসিংহ (বর্তমান নেত্রকোনা) জেলার দুর্গাপুরে। স্কুলশিক্ষা শেষ করার আগেই তিনি ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে জড়িয়ে অনুশীলন দলে যোগ দেন। অন্য বিপ্লবীদের সঙ্গে তাকে গ্রেফতার করা হয়। বন্দি অবস্থায় গভীরভাবে মার্কসবাদ অধ্যয়ন করে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে শ্রমিক আন্দোলনে সম্পৃক্ত হন। অচিরেই তিনি ময়মনসিংহে প্রত্যাবর্তন করে কৃষক আন্দোলন সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

মনি সিংহ ছিলেন প্রবাদখ্যাত কৃষক নেতা। হাজং এবং টঙ্ক আন্দোলনের নায়করূপে তার নাম ছড়িয়ে পড়ে সারা ভারতে। নিজের পরিবারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে হয়ে উঠেছিলেন কিংবদন্তির মহানায়ক। তিনি পাকিস্তান থেকে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের জন্য সর্বাত্মক আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন। এ জন্য পাকিস্তান সরকার তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে গিয়ে পরিবারের সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে। মণি সিংহের বাগ্মিতা ছিল অসাধারণ। তার তেজোদৃপ্ত ভাষণ কৃষকদের প্রাণে বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়ে দিত। আর তরুণ প্রাণে সৃষ্টি করত সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার নব উন্মাদনা যাকে বলে সৃষ্টি সুখের উল্লাস। চরম প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও অনেক তরুণ এ প্রক্রিয়ায় যুক্ত হন। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য না হয়েও কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন অনেক তুরুণ মণি সিংহের প্রভাব ও প্রেরণায় বিভিন্ন প্রগতিশীল সংগঠন গড়ে তুলে পাকিস্তানবাদের বিরুদ্ধে নবচেতনা জাগ্রত করেন। সে প্রচেষ্টার বিকশিত ফল আমাদের বাংলাদেশ। মণি সিংহ একজন দূরদর্শী

রাজনীতিক। তিনি ছিলেন গণমানুষের অতি আপনজন। হৃদয়ের মানুষ। তার সাধনাও ছিল মানুষের মুক্তি। সব শোষণ বঞ্চনার অবসান ঘটিয়ে স্বাধীন, স্বনির্ভর মর্যাদাশীল মানুষ হিসেবে সবার বেচে থাকার অধিকার সুনিশ্চিত করা।

তিনি টঙ্কপ্রথা বিলোপের জন্য আন্দোলন করেছেন। পরে টঙ্কপ্রথা বিলোপ করতে সরকার বাধ্য হয়েছে। জমিদারিপ্রথা উচ্ছেদের আন্দোলন করেছেন। সে প্রথা উচ্ছেদ হয়েছে। কৃত্তিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন। পাকিস্তান বিলুপ্ত হয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তার লড়াই আজও উত্তর প্রজন্ম অব্যাহত রেখেছে। তিনি বরাবরই ছিলেন একজন আধুনিক মানুষ। বিজ্ঞান ও উন্নত প্রযুক্তিকে স্বাগত জানাতেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি খুব জোর দিয়ে বলেছেন বিজ্ঞান এবং গণিত জানলে জাতি অগ্রসর হবেই। সে সঙ্গে ভাষাও ভালোভাবে শিখতে হবে। মণি সিংহ কোনো দিনই রাষ্ট্রক্ষমতায় না গিয়েও হয়ে উঠেছিলেন জননন্দিত মহাগণনায়ক। দেশের প্রগতিশীলরা তো বটেই সব সাধারণ মানুষের কাছেও তিনি ছিলেন মহান নেতা। রাজনৈতিক মহলে তিনি অভিহিত হতেন ‘বড় ভাই’ নামে। অনেকে তাকে বাংলার নয়নমণি হিসেবেও অভিহিত করেন। সর্বোপরি মণি সিংহ বাংলাদেশের মানবমুক্তির মহান পুরুষ। সাম্য ও মৈত্রীর অনন্যসাধক।

লেখক:

তারুণ্যের চেতনার অগ্নিমশাল

হাসান তারিক চৌধুরী

বাংলাদেশের তরুণদের কাছে যদি বিপ্লবী চে গুয়েভারার নাম উচ্চারণ করা হয় তাহলে নিঃসন্দেহে তাদের চোখের সামনে এক তেজোদ্দীপ্ত মুখচ্ছবি ভেসে উঠবে। আমাদের দেশের বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে কমরেড মণি সিংহ চে'র মতোই এক বিদ্রোহী তেজোদ্দীপ্ত বিপ্লবী নায়ক। তরুণরা সাধারণত অ্যাডভেঞ্চার-রোমান্টিকতা ভালোবাসে। সেজন্যই এরকম বিপ্লবী চরিত্রগুলো তাদের কাছে খুবই প্রিয়। গল্পকথার যে নায়ক মৃত্যুঝুঁকিকে তুচ্ছজ্ঞান করে দুর্বল-শোষিতের পাশে দাঁড়ায়, শত্রুর চোখে ধুলো দিয়ে নানা ছদ্মবেশে যিনি রবিনহুডের মতো আক্রান্তদের পাশে থাকেন সেরকম একজনকে বড় বেশি ভালোবাসে তরুণরা। মণি সিংহ তাই এদেশের তরুণদের প্রিয় একজন নেতা। বিশ বছর বয়সের সশস্ত্র যোদ্ধা মণি সিংহের সেই প্রতিকৃতি এখনো বাংলার বিপ্লবী তরুণদের চেতনার অগ্নিমশাল।

মণি সিংহকে যারা চোখে দেখেনি, শুধু বই পড়ে জেনেছে, আমি তাদেরই একজন। তাই যারা তাকে কাছে থেকে দেখেছেন কিংবা যারা অধিকতর বয়োজ্যেষ্ঠ তাদের থেকে মণি সিংহ সম্পর্কে আমার অনুভূতি স্বভাবতই ভিন্নতর। কমরেড মণি সিংহকে আমি শুধু কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে দেখতে চাই না, তাকে আমি দেখি একজন স্বপ্নবান বিপ্লবী হিসেবে। দেখি পরিবারের কঠোর অনুশাসন ভেঙে বেরিয়ে আসা প্রথাবিরোধী এক উদ্ধত তরুণকে। আমি দেখি তার স্বপ্নিল চোখ, যে চোখ দিয়ে তিনি শোষণহীন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখতেন। আমি দেখি তার সশস্ত্র মূর্তি, যে মূর্তি শোষক শ্রেণীর মনে মৃত্যুভয় ঢুকিয়ে দিয়েছিলো। আমি দেখি তার বন্ধুবৎসল হাসি আর মিশুক চরিত্র, যে চরিত্র তাকে সরল হাজংদের অকৃত্রিম বন্ধুকে পরিণত করেছিলো। দেখি সেই বৈশিষ্ট্যকে যার বলে তিনি হয়ে ওঠেন 'মণিরাজ'। তরুণরা স্বভাবতই এরকম একজন অকৃত্রিম বিপ্লবী বন্ধুকে ভালবাসে।

১৯০১ সালের ২৮ জুলাই কলকাতার এক মধ্যবিত্ত পরিবারের কমরেড মণি সিংহ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা কালী কুমার সিংহের মৃত্যু হলে মা সরলা দেবী ৭ বছরের মণি সিংহকে নিয়ে নেত্রকোনা জেলার সুসং দুর্গাপুরে চলে আসেন। এখানে সরলা দেবী ভাইয়ের জমিদারির অংশীদার হয়ে বসবাস শুরু করেন। এখানে স্কুলে পড়ার সময়েই মণি সিংহ ব্রিটিশ উপনিবেশবিরোধী আন্দোলনের যোগ দেন। যোগ দেন বিখ্যাত সশস্ত্র বিপ্লবী দল 'অনুশীলন'-এ। ১৯১৭ সালের রুশবিপ্লবের আদর্শে অনুপ্রাণিত কমরেড মণি সিংহ প্রখ্যাত বিপ্লবী গোপেন চক্রবর্তীর সঙ্গে আলোচনার পর মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি ১৯২৮ সাল থেকে কমিউনিস্ট পার্টির সার্বক্ষণিক কর্মী হিসেবে নিজেকে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে উৎসর্গ করেন। এসময় তিনি কলকাতায় শ্রমিক

আন্দোলনের একনিষ্ঠভাবে কাজ করতে থাকেন। ১৯৩০ সালের ৯ মে তিনি গ্রেপ্তার হয়ে যান। ১৯৩৭ সালে জেল থেকে বেরিয়ে তিনি নেত্রকোনা এলাকায় গারো, হাজং ও মুসলমান কৃষকদের সঙ্গে নিয়ে টঙ্ক প্রথার বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলেন। এ আন্দোলন তাকে গারো-হাজংদের অবিসংবাদিত নেতায় পরিণত করেন। পাকিস্তান হবার পর তৎকালীন সরকার তার বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি করে। আইয়ুব খান সরকার তাকে ধরিয়ে দেয়ার জন্য ১০ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে। পাকিস্তান হবার পর থেকে তিনি প্রায় ২০ বছর আত্মগোপনে থাকতে বাধ্য হন। ১৯৫১ সালে কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় সম্মেলনে তিনি আত্মগোপন অবস্থায় পার্টির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৬১ সালে ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের চাপে অন্যান্য রাজবন্দির সঙ্গে তিনি জেল থেকে বেরিয়ে আসেন। ওই বছরই ২৫ মার্চ সামরিক আইন জারি হলে তিনি পুনরায় গ্রেপ্তার হন। পরবর্তীতে অসহযোগ আন্দোলনের সময় অনেক নেতাকে মুক্তি দিলেও ইয়াহিয়া সরকার কমরেড মণি সিংহকে মুক্তি দেয়নি। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হরে বন্দিরা রাজশাহীর জেল ভেঙ্গে তাকে মুক্ত করেন।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সমর্থন সহযোগিতা আদায়ে কমরেড মণি সিংহের অবদান ছিল অপরিসীম। তিনি ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি, ছাত্র ইউনিয়নের গেরিলা বাহিনী গড়ে তুলে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দেন। মুজিব নগর সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের তাকে নির্বাচিত করা হয়।

জেনারেল জিয়ার সামরিক শাসন চলাকালে ১৯৭৭ সালে এই বিপ্লবী আবার গ্রেপ্তার হন। সে সময় তাকে ৬ মাস কারাগারে থাকতে হয়। বিপ্লবী এই যোদ্ধা ৮৪ বছর বয়স পর্যন্ত সক্রিয়ভাবে পার্টির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯০ সালের ৩১ ডিসেম্বর তার দীর্ঘ বিপ্লবী জীবনের অবসান ঘটে।

কমরেড মণি সিংহ তার বর্ণাঢ্য ও শিক্ষণীয় জীবনের মাধ্যমে সততা, আপসহীনতা, সময়ানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন।

কমরেড মণি সিংহ তাই আজো আমাদের চেতনা অগ্নিমশাল। কমরেড মণি সিংহ চিরঞ্জীব।

লেখক:

সাবেক সভাপতি, ছাত্র ইউনিয়ন; শান্তি পরিষদ নেতা

জীবন সংগ্রামে কমরেড মণি সিংহ

ডা. দিবালোক সিংহ

কমরেড মণি সিংহ মেলা

ভাস্বর পুরুষ

শামসুর রাহমান

তুমি কি মিলিয়ে গেলে শূন্যতায় ভাস্বর পুরুষ ?
না, তুমি নিদ্রিত দ্বিপ্রহরে;
যেন যুদ্ধ বিরতির পর কোনো পরিশ্রান্ত সেনানী বিশ্রামে
ভরপুর। তোমার নিদ্রার মসলিন
কিছুতে হবে না ছিন্ন চিলের কান্নায়, প্রতিবাদী
মানুষের যৌথ পদধ্বনিতে অথবা
রক্ত গোলাপের মতো পতাকার জাগর স্বননে
জোয়ারের প্রবল উচ্ছ্বাসে।

তোমার নিস্পন্দ, প্রাজ্ঞা চোখের পাতায়
ঘুমিয়ে রয়েছে আমাদের স্বপ্ন সমুদয় আর
অনেক আকাঙ্ক্ষা স্তব্দ তোমার বাহুতে, শপতের
বাক্যগুলি নিদ্রিত ওষ্ঠের তটে পুনরায় জেগে
উঠবার প্রত্যাশায়। দশদিক থেকে
নম্র পায়ে লোক আসে অর্ঘ্য দিতে আজ
তোমারই উদ্দেশ্যে হে নন্দিত কিংবদন্তি। সকলের
মাঝে ছিলে; কৃষক, মজুর, ছাত্র সবার হৃদয়ে
করেছো রোপণ
মানবিক বীজ নিত্য কর্মিষ্ঠ চাষীর মতো। জাগো,
জেগে ওঠো স্বতন্ত্র মানব
পৃথিবীর রৌদ্রে ফের ঝেড়ে ফেলে মৃত্যুর তুষার ।

ভাস্বর পরুষ, সংগ্রামকে জীবনের সারসত্য
জেনে তুমি নিয়ত হেটেছো পথে। যেখানে তোমার পদচ্ছাপ
পড়েছে প্রগাঢ় সেখানেই সাম্যবাদ চোখ মেলাবার
অভিলাষ করেছে প্রকাশ। কী ব্যাপার মমতায়
তাকিয়েছো বার বার ভবিষ্যতের দিকে। প্রগতির
প্রসিদ্ধ চার চারণ জাগো, জেগে ওঠো, চেয়ে দ্যাখো,
করোনি শাসন কোনোদিন তবু বাংলাদেশ আজ
তোমাকেই গার্ড অব অনার জানায়।

তৎকালীন যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটো-এর সাথে কমরেড মণি সিংহ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবরের সাথে আলোচনারত কমরেড মণি সিংহ

আশির দশক ঃ কমরেড মণি সিংহের জন্মদিনে মোহাম্মদ ফরহাদ, বারীণ দত্ত, আবুল কালাম আজাদ, হারুনর রশীদ লাল, দিবালোক সিংহ টুটুল, মওলানা হোসেন আলী প্রমুখ

মুক্তিপ্রাপ্ত কমরেড মণি সিংহ

শৈশবে কমরেড মণি

পারিবারিক ছবি

পারিবারিক ছবি

বিশ বছর বয়সে মণি সিংহ

Caption

Caption

Caption

Caption

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৭ পৌষ ১৪২১
৩১ ডিসেম্বর ২০১৪

বাণী

মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের উপদেষ্টা, উপমহাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের পুরোধা এবং বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) প্রতিষ্ঠাতা কমরেড মনি সিংহ-এর ২৪তম মৃত্যুবার্ষিকীতে আমি তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

কমরেড মনি সিংহ বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন এবং বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনসহ সারাজীবন কৃষক, শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যুক্ত ছিলেন।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে কমরেড মনি সিংহের রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল গভীর সৌহার্দ্যপূর্ণ। স্বাধীনতার পর যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

কমরেড মনি সিংহ-এর ২৪তম মৃত্যুবার্ষিকীতে আমি তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

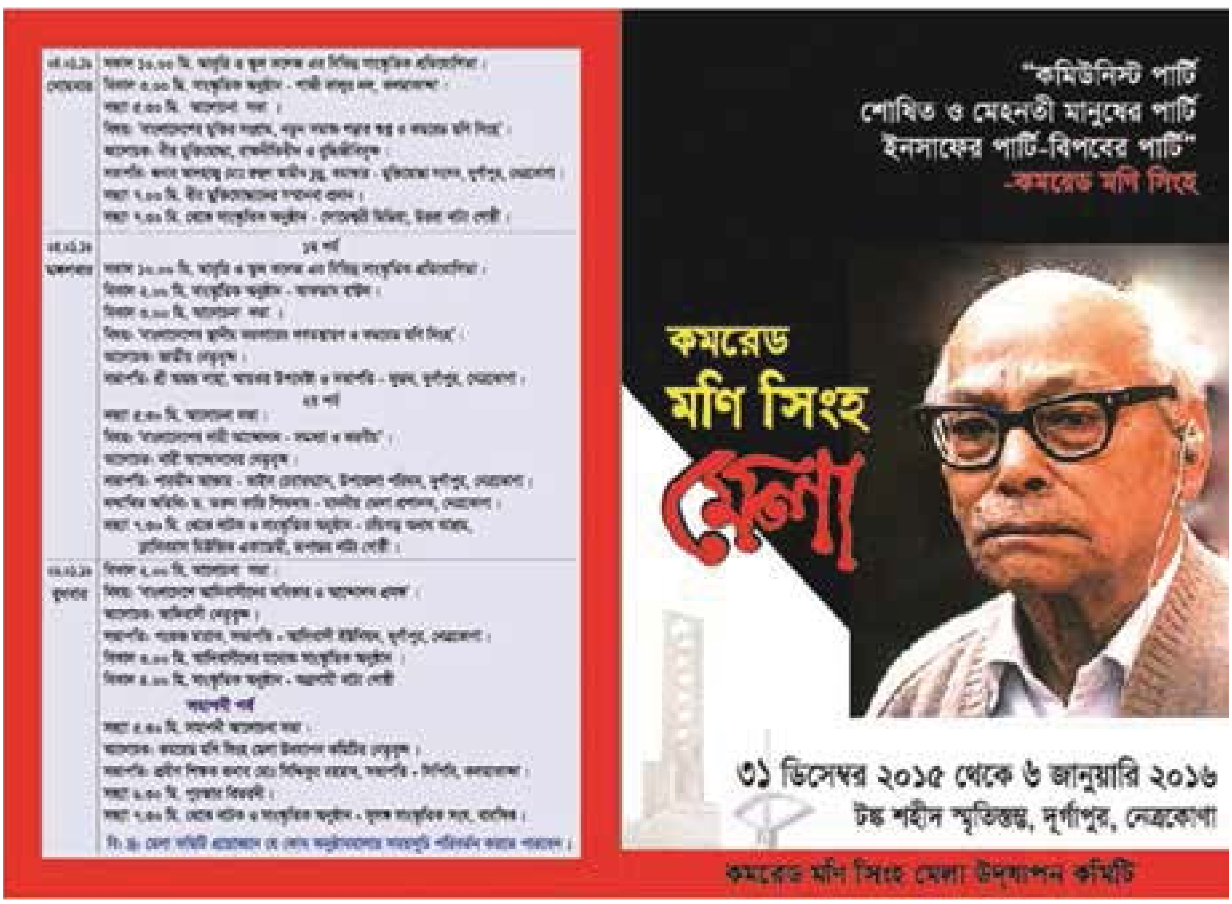

টঙ্ক স্মৃতি স্তম্ভ